দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

বাম আমলের বারুদের স্তূপ তৃণমূল আমলে প্রাণঘাতী বিস্ফোরক
— পৃঃ ২৪

হিন্দুত্বের প্রথম প্রবক্তা বাঙালি চন্দ্রনাথ বসু
— পৃঃ ১০

৭২ বর্ষ, ২১ সংখ্যা।। ২৭ জানুয়ারি, ২০২০।। ১২ মাঘ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

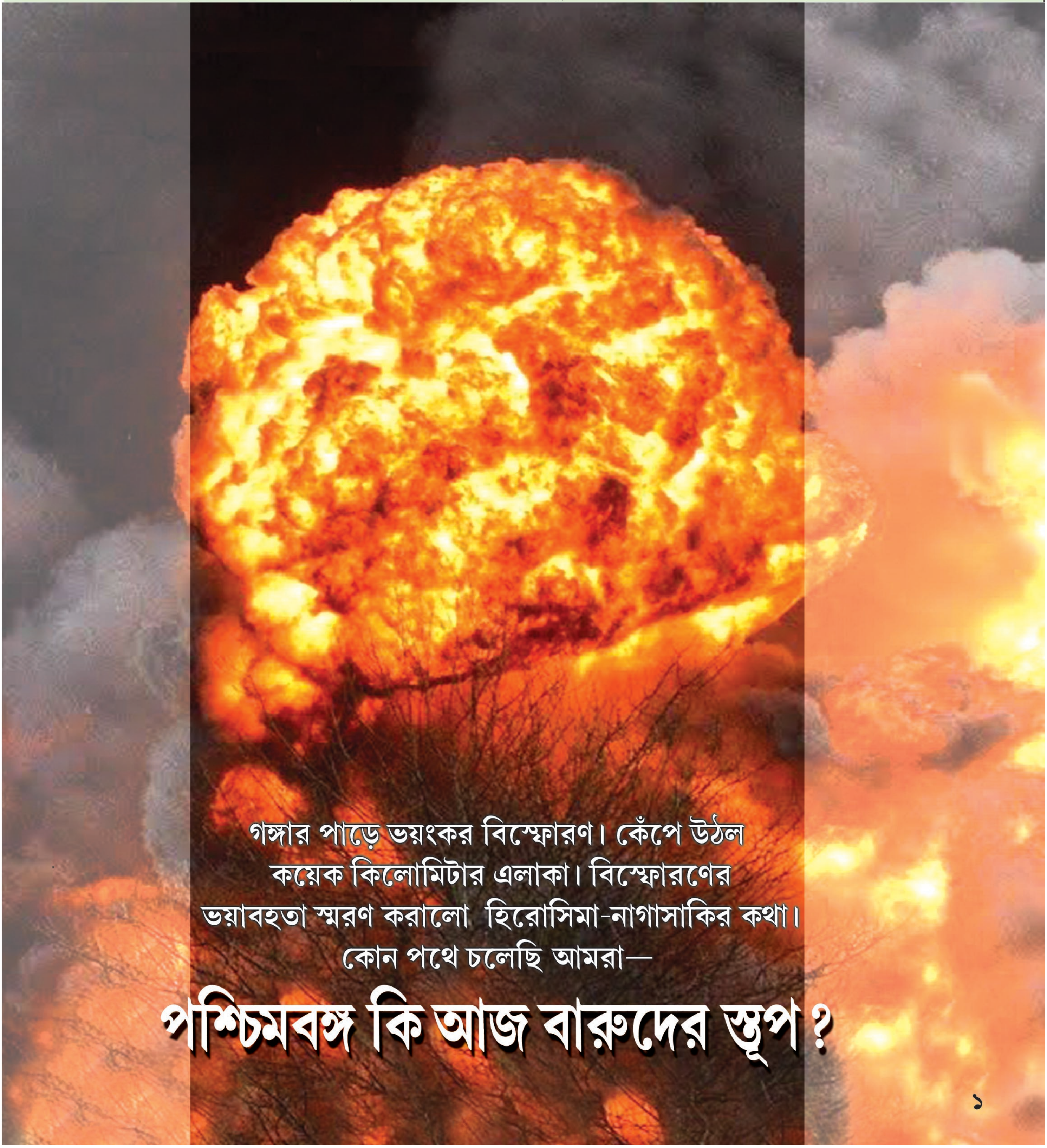

গঙ্গার পাড়ে ভয়ংকর বিস্ফোরণ। কেঁপে উঠল কয়েক কিলোমিটার এলাকা। বিস্ফোরণের ভয়াবহতা স্মরণ করালো হিরোসিমা-নাগাসাকির কথা। কোন পথে চলেছি আমরা—

পশ্চিমবঙ্গ কি আজ বারুদের স্তূপ ?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ১২ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২৭ জানুয়ারি - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

অর্থ-সামাজিক আন্দোলনে টলমল হংকং
□ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ৬

সংবিধানসম্মত নাগরিকত্ব আইন বিরোধীদের ছলনায় অবরুদ্ধ
□ মহেশ জেঠমালানী □ ৮

হিন্দুত্বের প্রথম প্রবক্তা বাঙ্গালি চন্দ্রনাথ বসু
□ বিনয়ভূষণ দাস □ ১০

বঙ্গপ্রদেশে ইংরেজ শাসনের পটভূমি
□ নারায়ণ শঙ্কর দাশ □ ১৩

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত □ রঞ্জন কুমার দে □ ১৫

মরিচঝাঁপি গণহত্যা হলো বামজমানার আদি পাপ
□ রুদ্রাক্ষ বসু □ ১৭

বাঙ্গালির উঠোনে হিরোসিমার ট্রেলর
□ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ২৩

বাম আমলের বারুদের স্তূপ তৃণমূল আমলে প্রাণঘাতী বিস্ফোরক □ সুজিত রায় □ ২৪

বোমা শিল্পেও এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ □ রণিতা সরকার □ ২৬

শীতল ষষ্ঠী নবান্নের মতোই এক শস্য উৎসব
□ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে দেবী সরস্বতী □ সপ্তর্ষি ঘোষ □ ৩৩

গল্প : চলো কলকাতা □ শেখর সেনগুপ্ত □ ৩৫

গল্প : অমলিন পুষ্পলতা □ রূপশ্রী দত্ত □ ৩৭

একই বৃন্তে চারটি কুসুম □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩৮

খোলা চিঠি : আগুন পোহাচ্ছেন দিদি □ সুন্দর মৌলিক □ ৪৩

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় হিন্দু বাঙ্গালির আত্মত্যাগ
□ চন্দন রায় □ ৪৪

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **কৃষিকর্ম : ২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য : ২২** □ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**□ **খেলা : ৪২** □ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৯** □ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
৩ ফেব্রুয়ারি
২০২০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৩ ফেব্রুয়ারি
২০২০

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

খেলার মাঠে রাজনীতি

সম্প্রতি মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল ম্যাচে একটি ফেস্টুন সকলেরই চোখে পড়েছে। ফেস্টুনটিতে লেখা ছিল 'রক্ত দিয়ে কেনা মাটি, কাগজ দিয়ে নয়।' বলা বাহুল্য, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে লেখা হয়েছে ফেস্টুনটি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যারা এই ফেস্টুন লিখেছেন তারা কি জানেন, ১৯১১ সালে ব্রিটিশ ক্যালকাটা ক্লাবের বিরুদ্ধে খালি পায়ে ফুটবল খেলে মোহনবাগানের আই এফ এ শিল্ড জয়ের ইতিহাস? তারা কি জানেন, ইস্টবেঙ্গল দলের নাম 'ইস্টবেঙ্গল' রাখা হয়েছিল কেন? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— 'খেলার মাঠে রাজনীতি' হলেও আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটাকে, যা একই সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ছিন্নমূল হিন্দু বাঙ্গালির ঘরে ফেরার স্মৃতি উসকে দেয়। লিখবেন দেবতনু ভট্টাচার্য, সঞ্জয় সোম, দেবাশিস লাহা প্রমুখ।

সত্বর কপি বুক করুন।। দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank - Kolkata
Branch : **Shakespeare Sarani**

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নাশকতার গভীর ছক

নৈহাটির বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষের মনে বিভ্রম সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ নৈহাটি এবং নাগাসাকির ভিতর তফাত করিতে পারিতেছে না। না পারিবার কারণও রহিয়াছে। ওই বিস্ফোরণের যে চিত্র সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াই এই প্রশ্ন উঠিতেছে— নৈহাটি, না নাগাসাকি? এই প্রশ্নের ভিতর কিঞ্চিৎ শ্লেষ এবং কৌতুক থাকিলেও অনেকখানিই আতঙ্ক মিশিয়া আছে। নৈহাটির ওই বিস্ফোরণকে যতই আতসবাজি কারখানায় বিস্ফোরণ বলিয়া পুলিশ আধিকারিকেরা বুঝাইতে চেষ্টা করুন না কেন, প্রকৃত অর্থে ইহা যে আতসবাজি কারখানার নিরামিষ বিস্ফোরণ নয়, তাহা শুধু স্থানীয় মানুষজন নয়, সমগ্র রাজ্যবাসীর বুঝিতে অসুবিধা হইতেছে না। ওই বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গঙ্গার অপর পারের বাসিন্দারাও আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সাধারণ বাজি কারখানার বিস্ফোরণে এতটা তীব্রতা কখনো পরিলক্ষিত হয় না। প্রাথমিক তদন্তে এইরূপই মনে করা হইতেছে যে, নিছক বাজি তৈয়ারি করিবার মশলা নয়, ওই স্থানে এমন অনেক রাসায়নিক মজুত করা ছিল যাহা বড়োসড়ো বিস্ফোরণ ঘটাইবার কাজে লাগে। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, বাজি কারখানার খোলসে ওই স্থানে কাহারা কী কাণ্ড করিতেছিল? প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন এইরূপ বিস্ফোরক তাহারা মজুত করিয়াছিল কেন? কোন উদ্দেশ্যে এই বিস্ফোরক মজুত করা হইয়াছিল? উদ্দেশ্য যে আদপেই সৎ ছিল না তাহা ব্যাখ্যা না করিলেও বুঝা যায়। তবে, নৈহাটিতেই যে প্রথম এইরূপ ঘটিল তাহা নহে। ইহার পূর্বে খাগড়াগড়েও অনুরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছে। খাগড়াগড়েও প্রথমে বিস্ফোরণকে বাজি কারখানার বিস্ফোরণ বলিয়া পুলিশ লঘু করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। পুলিশি তদন্তও যথাযথভাবে হইতেছিল না।

অবশেষে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আসিয়া তদন্ত শুরু করিবার পর ঝুলি হইতে আসল বিড়ালটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তদন্তে প্রমাণ হইয়াছে, খাগড়াগড়ে বাজি কারখানার আড়ালে নাশকতামূলক কাজের জন্য প্রস্তুতি লওয়া হইতেছিল। এবং ওই উদ্দেশ্যেই মারাত্মক সব বিস্ফোরক ওই স্থানে মজুত করা হইয়াছিল। এই কাজের পিছনে যে ইসলামিক মৌলবাদী জেহাদি গোষ্ঠী জড়িত—তদন্তে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। নৈহাটি ও খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণে চরিত্রগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। দুই ক্ষেত্রেই পুলিশের ভূমিকা আদৌ সন্তোষজনক নহে। দুই ক্ষেত্রেই প্রথম হইতেই পুলিশ ঘটনার গুরুত্ব লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়াছে। খাগড়াগড়ের ঘটনায় যে রূপ হইয়াছে, সেইরূপ নৈহাটির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করাইলেই একমাত্র সত্য উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা। এবং তাহা যদি হয়, তবে নিশ্চিত ইহাই প্রমাণিত হইবে এই দেশে নাশকতার উদ্দেশ্যে জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি নৈহাটিতেও বিস্ফোরক মজুত করিতেছিল। এইসবেরও বহু পূর্বে বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে নয়ের দশকেও একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল কলকাতা। বউবাজার এলাকার কুখ্যাত সাট্টা ডন রশিদ খানের ডেরার সেই বিস্ফোরণের প্রাবল্যে একটি বাড়ি সম্পূর্ণ রূপে ধসিয়া পড়িয়াছিল। রাজনৈতিক সংঘর্ষে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই ওই স্থানে শক্তিশালী বিস্ফোরক মজুত করা হইয়াছিল।

এই সমস্ত ঘটনাই অন্তরে আশঙ্কার সৃষ্টি করে। সহজেই বুঝা যায় বহুদিন হইতেই পশ্চিমবঙ্গ বারুদের স্তূপের উপর অবস্থান করিতেছে। ইদানীং জঙ্গি জেহাদিরা তাহাদের লক্ষ্যবস্তু বানাইয়াছে পশ্চিমবঙ্গকে। পশ্চিমবঙ্গের, সর্বোপরি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে, যাহারা এই নাশকতার ছক করিতেছে অবিলম্বে তাহাদের চিহ্নিত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

সুভাষিতম্

ধর্মঃ যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুধর্মঃ তৎ।

অবিরোধাৎ তু যো ধর্মঃ স ধর্মঃ সত্যবিক্রম।।

হে রাজা সত্যবিক্রম! যে ধর্ম অন্য ধর্মের বাধক হয় তা ধর্ম নয়, কুধর্ম। যে ধর্ম কোনো ধর্মের বিরোধিতা করে না, সেই ধর্মই প্রকৃত ধর্ম।

আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনে টলমল হংকং

আন্তর্জাতিক

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

১৮৪২ সালের চিং রাজবংশ পর্যন্ত হংকং মূল চীন দ্বারা শাসিত ছিল। তারপর নানকিংয়ের চুক্তিবলে দ্বীপটিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং এরপর দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের পরে ১৮৯৮ সালে কোওলুন উপদ্বীপকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এটি জাপানি সাম্রাজ্যের দখলে ছিল।

দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পরে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। কিন্তু জাতিসঙ্ঘ ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তাইওয়ানকে আসল চীন বলে মানত। ওই বছর জাতিসঙ্ঘ তাইওয়ানের পরিবর্তে মূল চীনকে স্বীকৃতি দেয়। চীন অনুরোধ করেছিল যে হংকংকে জাতিসঙ্ঘের অ-স্বশাসিত অঞ্চলগুলির তালিকা থেকে অপসারণ করা হোক। এই ভাবে হংকংকে তার স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরের চীন-ব্রিটিশ যৌথ ঘোষণাপত্রে হংকঙের সার্বভৌমত্ব ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে স্থানান্তর করার শর্ত দেওয়া হয় এবং তা ১৯৯৭ সালে ১ জুলাই একটি বিশেষ 'হস্তান্তর' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

দুই সরকারের মধ্যে শর্ত হয়েছিল যে হস্তান্তরের পরে হংকঙের ভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থাপনা বজায় রাখা হবে এবং পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক সরকার গড়ার লক্ষ্য নিয়ে হংকঙের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো হবে। এই গ্যারান্টি চীন-ব্রিটিশ যৌথ ঘোষণাপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং হংকঙের আধা-সাংবিধানিক মূল আইনে অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুরুতে অনেক হংকংবাসী হংকঙের চীনে মিশে আসার বিষেয়ে উৎসাহী ছিল।

তবে, হংকঙের বাসিন্দা এবং মূল ভূখণ্ড, বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ১৯৯৭ সাল থেকে, বিশেষ করে ২০০০-এর প্রথম দশকের শেষের দিকে এবং ২০১০-এর দশকের শুরুতে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। বিবাদ বেঁধেছিল যে কারণে তার মধ্যে আছে— ব্যক্তিগত ভ্রমণ পরিকল্পনা এবং গুয়াংঝোউ-শেনজেন-হংকং এক্সপ্রেস রেল লিঙ্ক। কিছু লোক ২০১১ সালে যুক্তি দেখায় যেহেতু হংকং সরকার বেসিক আইনের ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাই হংকঙের প্রতি বেজিংয়ের অপেক্ষাকৃত 'দূরে থাকো' পদ্ধতির নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। তাদের মত এই চীনের কৌশল হলো হংকং ও চীনের বাকি অংশগুলির মধ্যে সীমানা মুছে ফেলা; মূল ভূখণ্ডের চীন সরকারের কিছু প্রতিনিধি হংকঙের রাজনৈতিক এবং আইনি ব্যবস্থার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। আরও আনুষ্ঠানিকভাবে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল যাতে দাবি করা হয় যে হংকঙের বিচার বিভাগকে সরকারের অধীনস্থ হতে হবে, স্বতন্ত্র নয়। বেসিক আইন এবং চীন-ব্রিটিশ যৌথ ঘোষণাপত্র হংকঙের সার্বজনীন ভোটাধিকারের লক্ষ্যে নির্বাচনী ব্যবস্থা বিকাশ করার চূড়ান্ত আশ্বাস দেয় তবে আইন পরিষদের অধিকতর গণতন্ত্রপন্থীরা একটু একটু করে সংস্কারের পদ্ধতি মানেনি। কেন্দ্রীয় সরকার যখন এগিয়ে এল তখন প্যান-ডেমোক্র্যাটরা 'সব-চাই-বা-কিছু-চাই-না' কৌশল অবলম্বন করেছিল যার ফলে ২০০৮-২০১৮ সালের মধ্যে নির্বাচনের আশা শেষ হয়ে যায়।

হংকঙের বিক্ষোভকারীরা ২০১২ জাতীয় দিবসে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শি জিনপিংয়ের প্রতিকৃতিতে ডিম ছোঁড়ে। ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং আন্তর্জাতিক শহর হিসাবে হংকঙে অতীতকাল থেকে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রয়েছে, একই সঙ্গে অনেকগুলি ঐতিহ্যবাহী চীনা সাংস্কৃতিক মূলবোধ ধরে রেখেছে, তারা মূল ভূখণ্ডের চীনের বহু অংশের সংস্কৃতির থেকে একেবারে বিপরীতে রয়েছে; মূলচীনে বহু আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক মান কখনই শেকড় গাড়তে পারেনি, বরং মূল চীনা ধারার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ আরও বেড়েছে। হংকং একটি বহুজাতিক সমাজ, মূল ভূখণ্ডের থেকে তার জাতি-ভাষা-সংস্কৃতি ভিন্ন। হংকঙের আছে খুব উন্নত অর্থনীতির সঙ্গে খুব উচ্চমানের জীবনযাত্রা, মূল ভূখণ্ডের চীনের তুলনায় স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কিত ভিন্ন মূল্যবোধ। সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্য হংকং এবং মূল ভূখণ্ডের চীনের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রাথমিক কারণ, তাছাড়া মূল ভূখণ্ড থেকে আগন্তুকের সংখ্যা বৃদ্ধি উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। হংকং ট্যুরিজম বোর্ডের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে ২৮ জুলাই ২০০৩-এ 'ব্যক্তিগত পর্যটন

পরিদর্শন' প্রকল্প কার্যকর হওয়ায় মূল ভূখণ্ডের দর্শনার্থীর সংখ্যা ২০০২ সালে ৬৮.৩ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০১৩ সালে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ হয়েছে। মূল ভূখণ্ড এবং হংকঙের বিভিন্ন খাতে যেমন স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে ব্যয় যথাক্রমে দুই অংশের সম্পদ বণ্টনের সঙ্গে জড়িত।

২০১১-র ৫ ফেব্রুয়ারি হংকঙের ট্যুর গাইড লি কিয়াঝেনের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের তিন পর্যটকদের ঝগড়া হয়েছিল। লি পর্যটকদের অপমান করে তাদের 'কুকুর' বলেছিলেন। পর্যটকরা ক্ষেপে গেলে তা শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে পরিণত হয়। লি এবং তিনজন পর্যটককে শারীরিক নির্যাতনের জন্য পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল।

২০১৯ সালে এপ্রিল মাসে প্রত্যর্পণ বিল প্রবর্তিত হয়েছিল। এর ফলে বিক্ষোভের সূচনা হয়। এই বিলের বলে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অপরাধমূলক সন্দেহভাজনদের মূল ভূখণ্ড চীনে প্রত্যর্পণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। বিরোধীরা বলেছে যে এর দরুণ হংকংবাসীরা অবিচার ও হিংস্র আচরণের মুখে পড়বে। এই বিলের কারণে হংকঙের উপর চীনের প্রভাব বাড়বে, তারা হংকঙের নেতা, কর্মী ও সাংবাদিকদের নিশানা করতে এর অপব্যবহার করবে। কয়েক হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। কয়েক সপ্তাহ বিক্ষোভের পরে, নেতা ক্যারি ল্যাম শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন যে এই বিলটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হবে।

কীভাবে বিক্ষোভ বাড়ল?

বিক্ষোভকারীরা বিলটি পুনরুদ্ধার করতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিল, তাই বিক্ষোভ অব্যাহত রেখে, এটা পুরোপুরি প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছিল। ততক্ষণে পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ আরও ঘন ঘন এবং হিংস্র হয়ে উঠেছিল। জুলাইয়ের বিক্ষোভকারীরা সংসদে হামলা চালিয়ে এর কিছু অংশকে বিদ্রূপ করে। আগস্টে এক প্রতিবাদকারীর চোখে আঘাত লাগে, সংহতি দেখানোর জন্য লাল বর্ণের চোখের প্যাঁচ পরে প্রতিবাদীরা বিক্ষোভ দেখায়। আগস্টে হংকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিক্ষোভ কর্মসূচিতেও নতুন করে সংঘর্ষ বেঁধেছিল এবং কয়েকশো উড়ান বাতিল করা হয়েছিল। বিলটি শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বরে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, তবে বিক্ষোভকারীরা বলেছিলেন এটি 'খুব অল্প, খুব দেরিতে'।

বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে, হিংসা ক্রমবর্ধমান। ১ অক্টোবর, যখন চীন কমিউনিস্ট পার্টির শাসনের ৭০ বছর উদ্‌যাপন করছিল, তখন হংকংয়ে সবচেয়ে হিংসাত্মক এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। বিক্ষোভকারীরা লাঠি, পেট্রোল বোমা এবং অন্যান্য জিনিস ছুঁড়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। ১৮ বছর বয়সী একজনের বুকে গুলি লেগেছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় সরকার প্রতিবাদকারীদের মুখোশ পরা নিষিদ্ধ করেছিল। এই নিষেধাজ্ঞা অনেক প্রতিবাদী কর্মী অস্বীকার করে চলেছে।

নভেম্বরের প্রথম দিকে, বেজিংপন্থী একজন আইনজীবীকে এক ব্যক্তি সমর্থক হওয়ার ভান করে রাস্তায় ছুরিকাঘাত করেছিল। এক সপ্তাহ পরে, যখন কর্মীরা একটি সড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করছিল তখন এক পুলিশ এক প্রতিবাদকারীকে কাছ থেকে গুলি করে এবং পরে সেদিন আরেকজনকে সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। দুজনকেই হাসপাতালে চিকিৎসা করতে হয়েছিল। আন্দোলনকারীরা কী চায়?

কিছু প্রতিবাদকারী এই নীতি গ্রহণ করেছেন : 'পাঁচটি দাবি, একটিও কম নয়!' দাবিগুলো হলো—

বিক্ষোভগুলিকে 'দাঙ্গা' হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না।

গ্রেপ্তারকৃত বিক্ষোভকারীদের জন্য ক্ষমা।

পুলিশের বর্বরতার অভিযোগে একটি স্বাধীন তদন্ত।

সম্পূর্ণ সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ।

পঞ্চম দাবি, বিল প্রত্যাহার, ইতিমধ্যে পূরণ করা হয়েছে।

কেউ কেউ ক্যারি লামের পদত্যাগও চান, তাঁকে তাঁরা বেজিংয়ের পুতুল হিসেবে দেখেন। হংকং আন্দোলনকে সমর্থন করে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আবার বিক্ষোভকারীদের সমর্থনকারী লোকজন ও বেজিংপন্থী সমাবেশগুলির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে।

চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সতর্ক করেছেন, চীনকে বিভক্ত করার যে কোনও চেষ্টা করলে 'মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব'।

হংকঙের নিজস্ব বিচার বিভাগ এবং মূল ভূখণ্ড চীন থেকে পৃথক আইনি ব্যবস্থা রয়েছে। এই অধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে সমাবেশের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা। তবে এই স্বাধীনতাগুলি— বেসিক আইনের মেয়াদ ২০৪৭ সালে শেষ হয়ে যাবে, তখন হংকঙের অবস্থা কী হবে তা পরিষ্কার নয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই
স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।
টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।
ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

অতিথি কলম

সংবিধানসম্মত নাগরিকত্ব আইন বিরোধীদের ছলনায় অবরুদ্ধ

মহেশ জেঠমালানী

দেশব্যাপী ব্যাপৃত বিরোধী দলগুলির কপট বিক্ষোভগুলি বাদ দিলে সাম্প্রতিক নাগরিকত্ব সংশোধন আইন দীর্ঘদিন ধরে কাঙ্ক্ষিত এক বিরাট সংখ্যক শরণার্থীদের একটি দেশের নাগরিক হওয়ার মর্যাদা দিয়েছে। একই সঙ্গে আইনটি তৈরির সময় যাবতীয় সাংবিধানিক নৈতিকতার প্রশ্নকেও মাথায় রাখা হয়েছে। বাজারে এই আইনের বিরুদ্ধে প্রধানত দুটি কুৎসা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রথমত, এটি বিভেদমূলক কেননা আইনটি ৬টি বিশেষ ধর্মের লোকেদের জন্য ভারতীয় নাগরিকত্বের দরজা খুলে দিলেও হয়তো একই ধরনের সমস্যায় পড়া মুসলমানদের বাদ দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এটি খেয়ালখুশিমতো করা হয়েছে, কেননা ধর্মীয় নীপিড়নের কারণে মাত্র বিশেষ তিনটি দেশের শরণার্থীদেরই আওতাধীন করা হলেও অন্য প্রতিবেশী মায়নামার বা শ্রীলঙ্কার কথা ভাবা হয়নি।

এই বৈষম্যের অপবাদ দেওয়ার হেতু ইসলামি দেশগুলি কেবলমাত্র অমুসলমানদের ওপরই অত্যাচার চালায় না তারা নিজ ধর্মেরই আহমেদিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়কেও ছাড়ে না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ঘোরতর অপরাধী পাকিস্তানের ওপরই জোর দিতে হবে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রথম বিধান পরিষদে জিন্নাহ তার বক্তৃতায় পাকিস্তানকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান উপহার দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর লিয়াকত আলি খান মার্চ ১৯৪৯ সালের পাকিস্তান অ্যাসেম্বলিতে 'objective resolution' অনুমোদনের মাধ্যমে অচিরে পাকিস্তানে ইসলামীয় ধাঁচার ধর্মীয় সংবিধান তৈরির ব্যবস্থা করেন। তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে এই 'প্রাথমিক প্রস্তাব'কে সে সময় আহমেদিয়া ও শিয়া উভয় বিশ্বাসের অনুগামীরাও সমর্থন করেছিল।

এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকেই অমুসলমানদের ওপর নেমে আসে জঘন্য অত্যাচার কিন্তু সে সময় শিয়া ও সুন্নিরা ছিল অলস-দর্শক। চলতেই থাকে সংখ্যালঘু নিকেশ, পলায়ন ইত্যাদির যার পরিণতিতে বর্তমান পাকিস্তানে (বাংলাদেশ নয়) সংখ্যালঘুর সংখ্যা ১.৫ শতাংশে নেমেছে। বোঝাই যাচ্ছে বিধর্মীদের নিয়ম করে ধ্বংস সম্পূর্ণ করার পর একটি সংখ্যাগুরুত্বের ভিত্তিতে গৃহীত ধর্মীয় সংবিধান অনুযায়ী এবার আরও কড়া হয়ে শাসক নিজ ধর্মেরই তুলনামূলক কম কট্টরপন্থী অংশের দিকে নজর ঘোরায়। পরিণতিতে সম্প্রদায় দুটি প্রায় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার শিকার হয়।

> আইনটিকে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সংবিধানের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা রক্ষা ও সেই অনুযায়ী নাগরিক নীতি প্রণয়নেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যেকের প্রতি পূর্ণ সম্মান ও দায়িত্ব নিয়ে জানিয়ে যাই যে, আইনটি আদৌ বিভেদাত্মক নয়, বিভেদাত্মক এর বিরোধীরা।

এদিকে ভারতে সংশোধিত আইনের বিরোধীরা দেশ ও জাতিকে তারা যে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে বাস করে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে কখনও ক্লান্ত হচ্ছে না। এ থেকে একটা প্রশ্ন উঠে আসে যে, এই নিপীড়িত (আহমেদিয়া)-রা যেহেতু তাদের দেশের ধর্মীয় সংবিধানের ওপরই নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করত ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না ও চোখের সামনে অমুসলমান সংখ্যালঘুদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখেও তারা কোনো প্রতিবাদ করেনি। সুতরাং যদি বলা হয় তাদের ভারতের নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করে সংসদ সংবিধানের সঙ্গে কোনো অন্তর্ঘাত করেনি, সেটা কি ভুল?

দ্বিতীয়ত, ২০১১ সালের জনগণনায় ভারত সরকার এই আহমেদিয়া সম্প্রদায়ভুক্তদের মুসলমান ধর্মাবলম্বীদেরই একটা অংশ বলে নথিভুক্ত করেছে। অন্য মুসলমানরা কিন্তু এদের মুসলমান বলে মনে করে না। সেই সঙ্গে এদের ওপর অকথ্য নির্যাতন ও সব ধরনের হিংসাত্মক আক্রমণ চালায়। জামিয়া মিলিয়া ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভরত ছাত্ররা কিন্তু একবারও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেনি যে তারা আহমেদিয়াদের মুসলমান ধর্মাবলম্বী বলেই মনে করে।

একথা অস্বীকার করা যায় না ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রেই মুসলমান নেতৃত্বের একটা বড়ো অংশ

আহমেদিয়াদের কেবলমাত্র ধর্মচ্যুতই মনে করে না, তারা ভারতে এদের বসবাসটাই বন্ধ করে দিতে চায়। এ উদ্দেশ্যে সফল হতে তারা এদের বিরুদ্ধে সবরকম নির্যাতনমূলক ও চরম হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আহমেদিয়াদের নতুন করে এদেশে নাগরিকত্ব দিয়ে ডেকে আনা দেশের পক্ষে একধরনের সম্প্রদায়গত গৃহযুদ্ধ আহ্বান করারই শামিল। ভারত সরকারের দেশে নিরাপত্তা বিঘ্নকারী এমন কোনো কাজে হাত দেওয়াই হবে বিপজ্জনক। তাই এ প্রসঙ্গে আলোচনা অযৌক্তিক। পার্শ্ববর্তী দেশ মায়নামারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ও শ্রীলঙ্কায় তামিলদের হত্যাকে আমল না দিয়ে তাদের এই আইনের পরিধি থেকে বাদ দিয়ে সংবিধান নিয়ে তামাশা করা হয়েছে, এটা অভিযোগ।

মায়নামার তাদের দেশেই রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করেছে। তার কারণ তারা মনে করে রোহিঙ্গাদের আদি বাসভূমি বাংলাদেশ। ১৮২৪ সালে ইংরেজের শ্রম আইনের বলে তারা সাময়িক কাজকর্মের জন্য তৎকালীন বার্মায় এসেছিল। মায়নামারে অন্য বহু মুসলমান রয়েছেন যারা মায়নামারের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসী যার মধ্যে রাখাইন রাজ্যটিও আছে। এই মুসলমানরা কিন্তু জাতিগতভাবে রোহিঙ্গাদের থেকে আলাদা। এঁরা বার্মিজ ভাষাতেই কথা বলেন ও কোনো ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার নন। তাই রোহিঙ্গা সমস্যার উৎস কোনো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও মুসলমানদের সংঘর্ষের কারণে নয়। তাই বিষয়টি নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের আওতায়ই পড়ে না। নতুন আইনটি কেবলই মাত্র ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসা তিনটি দেশের নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু মানুষদের লক্ষ্যে।

এছাড়া রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের মধ্যে Arakan Rohingiya salvation Army নামে জঙ্গি গোষ্ঠী মায়নামারের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাতেও দেরি করেনি। এই ধরনের অতি আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া দেখানোর কারণে সরকার ARSA-কে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছে। International Crisis Group (ICG) জানিয়েছেন ARSA জঙ্গিরা বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। ভারতীয় তদন্ত সংস্থার অনুসন্ধান অনুযায়ী এই ARSA সংগঠন পাকিস্তানের আইএসআই, আন্তর্জাতিক জেহাদি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএসআইএস) ও আলকায়দা গোষ্ঠীর মদতপুষ্ট ও পরিচালিত। এই গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্তদন্তে আরও প্রকাশ যে, লস্কর-এ-তৈবা'র মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ভারতে জেহাদি কার্যকলাপ বাড়াতে রোহিঙ্গাদের মতো উগ্রপন্থীদের ভর্তি করতে চাইছে। ভারতের নাগরিকত্ব আইনে মায়নামারকে না রাখার এটাই অন্যতম কারণ। দেশের অভ্যন্তরে রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে আশঙ্কাজনক।

এবার শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে আগত তামিল উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গ। ২০০৯-এর পর থেকে শ্রীলঙ্কায় তামিল ও সিংহলীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ জাতিগত দাঙ্গা সম্পূর্ণ মিটে গেছে। সরাসরি পরাজয় ও ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীলঙ্কায় আজ Liberation of Tamil Tiger Elam (LTTE)-এর কোনো অস্তিত্ব না থাকায় সেখানে এখন সুস্থির ও শান্তির বাতাবরণ বিরাজ করছে। এরই ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ তামিলই শ্রীলঙ্কায় তাদের 'হোমল্যান্ডে' প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই ক্ষেত্রে UNCHR (রাষ্ট্রসঙ্ঘের) সংগঠন সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে তাদের সব রকম ভয়মুক্ত করেছে। সুতরাং আলোচ্য আইন থেকে শ্রীলঙ্কাকে বাইরে রাখা একশো ভাগ সঠিক।

উপরিল্লেখিত বিশ্লেষণ থেকে বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, নাগরিকত্ব বিল সম্পূর্ণ সংবিধান সম্মত। শুধু তাই নয়, এটি একটি মানবিকতার বোধে উদ্বুদ্ধ আইন। কেননা এটি আমাদেরই দেশে অন্যদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে নিরুপায় অবস্থায় এসে দুর্দশার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দেশ-হীন পরিচয়ে বাস করা মানুষদের নাগরিকত্ব প্রদানের মানবিক অঙ্গীকার। আইনটিকে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সংবিধানের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা রক্ষা ও সেই অনুযায়ী নাগরিক নীতি প্রণয়নেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যেকের প্রতি পূর্ণ সম্মান ও দায়িত্ব নিয়ে জানিয়ে যাই যে, আইনটি আদৌ বিভেদাত্মক নয়, বিভেদাত্মক এর বিরোধীরা। ■

আবেদন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বর্গত প্রচারক বসন্তরাও ভট্টের কর্মজীবন সংবলিত একটি গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বসন্তদার সান্নিধ্যে যাঁরা কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা তাঁর জীবনের বহু প্রেরণাদায়ী মুহূর্তের সাক্ষী রয়েছেন। সেই সব ঘটনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে তা বর্তমান প্রজন্মের কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদের প্রেরণাস্বরূপ হবে। সেজন্য এরকম কার্যকর্তা বা স্বয়ংসেবকদের লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। লেখার সঙ্গে নিজের পরিচয়, ঠিকানা ও ফোন নং দিতে হবে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, ২০২০।

—ভবদীয়—

অদ্বৈতচরণ দত্ত	**বিশ্বনাথ বিশ্বাস**
অঃ ভাঃ সহ প্রচারক প্রমুখ	সভাপতি
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ	পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

লেখা পাঠাতে হবে

সুদীপ তেওয়ারী	বাসুদেব পাল	গজানন বাপট
কার্যালয় প্রমুখ, কেশব ভবন	কল্যাণ ভবন	পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম
৮২৪০৯২১৫৪৪	৯৬৭৪৫১৪৯৫২	৯৪৩৩৯৮৮৯৪৫
	basudebp421@gmail.com	

হিন্দুত্বের প্রথম প্রবক্তা বাঙ্গালি চন্দ্রনাথ বসু

বিনয়ভূষণ দাশ

পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো গ্রামের মতোই অখ্যাত হুগলি জেলার হরিপাল থানায় অবস্থিত এই কৈকালা গ্রাম। অধুনা বিখ্যাত সিঙ্গুরের পথে পড়ে এই গ্রাম। আপাত বৈচিত্র্যহীন এই কৈকালাতেই জন্মেছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকরেরও আগে 'হিন্দুত্ব' শব্দ উদ্ভাবনকারী, এবং ওই নামের পুস্তকের রচয়িতা চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০)। তাঁর পিতার নাম সীতানাথ বসু। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দেই তিনি 'হিন্দুত্ব' শব্দটি উদ্ভাবন করে রচনা করেন 'হিন্দুত্ব' নামের সাধারণ্যে অপরিচিত কিন্তু বিখ্যাত পুস্তকটি। তাছাড়া তিনি বাঙ্গলায় 'অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদে'রও অন্যতম পথপ্রবর্তক। এ বিষয়ে তিনি পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু প্রবন্ধও লিখেছেন।

সাধারণভাবে 'হিন্দুত্ব' শব্দটি উদ্ভাবনের জন্য বীর সাভারকরকেই কৃতিত্ব দেওয়া হয়— যদিও ভুলভাবে। অন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও হিন্দু বাঙ্গালিই প্রথম কৃতিত্বের অধিকারী, আধুনিক হিন্দুত্বের ধারণারও প্রথম জন্ম হয়েছিল এই বঙ্গভূমিতে। 'হিন্দুত্ব' ভাষ্যেরও (Narrative) আদি জন্মস্থান এই বঙ্গদেশ। বাঙ্গলাকে একদল মানুষ সুচতুরভাবে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার আবাসভূমি আর উত্তরভারত ও মহারাষ্ট্রকে হিন্দুত্বের বিচরণভূমি হিসেবে চিত্রিত করে থাকেন। অথচ হিন্দুত্বের স্রষ্টা এবং আদি বিচরণভূমি এই বাঙ্গলা। সাভারকর 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থটি লেখেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে— চন্দ্রনাথ বসুর 'হিন্দুত্ব' পুস্তকটি লেখার প্রায় ৩১ বছর পরে। অর্থাৎ সাভারকরের বিখ্যাত পুস্তক যেটি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে Essentials of Hindutva, নামে প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আবার নাম বদল করে Hindutva : Who is a Hindu নামে প্রকাশিত হয়— তার অনেক আগেই, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রনাথ বসুর বইটি বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ২০১, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ওই পুস্তক প্রকাশ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায়, হিন্দু জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য বাঙ্গলায় অপরিচিত ছিল না উনবিংশ শতকেই। বরং হিন্দুত্বের মূল জন্মভূমি এই বঙ্গদেশ। চন্দ্রনাথ গৌরমোহন আঢ্য প্রতিষ্ঠিত 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র মূল স্কুলে ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসন, হারমান জেফ্রয়, ক্যাপ্টেন পামার, উইলিয়াম কার প্যাট্রিক, রবার্ট ম্যাকেঞ্জি প্রমুখ দিগগজ শিক্ষকের কাছে অধ্যয়ন করেন। এরপরে ওই সময়কার বেশিরভাগ শিক্ষিত বাঙ্গালির মতোই চন্দ্রনাথ বসুও পড়াশোনা করেছিলেন বিখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ওই কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক হন। পরের বছর, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ইতিহাসে এমএ পাশ করেন এবং তার পরের বছর তিনি এবং প্রখ্যাত আইনবিদ রাসবিহারী ঘোষ একসঙ্গে বিএল পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের যুক্তিবাদী প্রভাব তাঁর মধ্যে অনেকদিন অবধি ক্রিয়াশীল ছিল। এমনকী বেথুন সোসাইটির ষষ্ঠ অধিবেশনে, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ এপ্রিল 'The effects of English education upon Bengali Society' বিষয়ে এক আলোচনা সভায় চন্দ্রনাথ বসু ইংরেজি শিক্ষা, ইউরোপীয় আচার-ব্যবহার সমর্থন করেছিলেন। তিনি এটাও মনে করতেন, ইউরোপীয় আচার-ব্যবহার সমাজে যে চালু হবে তা কারও ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের ফলে স্বাভাবিকভাবেই তা আসবে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা তাঁর High Education in India নামক এক বক্তৃতার উল্লেখ করে লিখেছিল, "At last Thursday's meeting of the Bethune Society Babu Chandranath Bose M.A., delivered an exhaustive and eloquent lecture on High Education in India. The very Reved. Father Lafont presided and wound up the discussion with a thoughtful and telling speech." এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে দলাদলি, কেশবচন্দ্র সেনের অত্যধিক 'প্রত্যাদেশ'-বিশ্বাস, খ্রিস্টপ্রীতি ইত্যাদি শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মনে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। চন্দ্রনাথ বসুও এই প্রতিক্রিয়া মুক্ত ছিলেন না। তাঁর এই 'ইংরেজি ভাবাপন্ন' মনোভাব মোটামুটি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি বজায় ছিল।

এখন তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলছি। কিছুদিন আইন সম্পর্কিত দপ্তরে এবং ছয় মাসের জন্য ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করার পরে কলকাতাতে স্থায়ীভাবে বসতি শুরু করেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর নিযুক্ত হয়ে কয়েক বছর তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির (পরবর্তীকালে ন্যাশনাল লাইব্রেরি) 'লাইব্রেরিয়ান' হিসেবেও কাজ করেন। এছাড়া চন্দ্রনাথ বাঙ্গলা সরকারের অনুবাদক হিসেবে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কাজ শুরু করে ১৯০৪ সালে অবসরপ্রাপ্তি অবধি ওই পদেই কর্মরত ছিলেন। এছাড়া তিনি জয়পুর কলেজ, কলকাতার অধ্যক্ষ, টেক্সট বুক কমিটির সদস্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অস্থায়ী সহ-সভাপতি (১৮৯৬) এবং সভাপতি (১৮৯৭) হিসেবেও কাজ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই তিনিও প্রথমে ইংল্যান্ডের 'গৌরবময় বিপ্লব' সম্পর্কে ইরাজিতে লেখা শুরু করেন। এমনকী তাঁর এক প্রবন্ধ যেটি ১৮৬৪-তে প্রকাশিত হয়েছিল তার সম্পর্কে দি ইংলিশম্যান পত্রিকায় এক পর্যালোচনায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল যে রচনাটি আদৌ কোনো ভারতীয়ের লেখনিপ্রসূত কিনা! বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর এক পর্যালোচনার মধ্যেই স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা আবিষ্কার করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কথাতেই চন্দ্রনাথ বাংলায় লেখা শুরু করেন এবং তখনকার দিনের অগ্রণী সাহিত্যপত্রিকা 'বঙ্গদর্শনের' সাথে যুক্ত হন। এছাড়াও তিনি গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গলী', অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'নবজীবন' ইত্যাদি

পত্রিকাতেও নিয়মিত লিখতেন। চন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় ব্রাহ্ম সমাজের আলোচনায় মাঝে মাঝে যেতেন; এমনকী তিনি অল্প সময়ের জন্য হলেও ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। হিন্দুধর্মে তাঁর আস্থা ফিরে আসে উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে সাক্ষাতের পরে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে এই সাক্ষাৎকার ঘটে। এই সাক্ষাৎকারের পরেই শুরু হয় চন্দ্রনাথ বসুর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব।

এই দ্বিতীয় পর্বে তিনি হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য, পুস্তক রচনা এবং হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী কাজে নিজেকে মগ্ন করেন। সমালোচক খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, ''যাহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া হিন্দু ও হিন্দুত্বকে কেবল ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে, তাহাদিগের মনে ঘৃণার পরিবর্তে অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দেওয়াও যেমন একটি কর্তব্য, তেমনিই আর একটি কর্তব্য, হিন্দুধর্মের মধ্য হইতে স্ব-ধর্মনিরত হিন্দুদিগের নিমিত্ত অনুরাগের ও শ্রদ্ধার সামগ্রী আহরণ করা। সমাজ-বন্ধন যে স্থানে শিথিল হইয়াছে, সে স্থানে সে বন্ধন দৃঢ় করা এবং যে স্থানে দৃঢ় আছে, সে স্থানে তাহা চিরকাল দৃঢ় রাখিবার বন্দোবস্ত করা উভয়ই কর্তব্য কর্ম। চন্দ্রনাথবাবুর সমস্ত শক্তি এই কাজে নিয়োজিত হইল।" এই পর্বে চন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে শকুন্তলা তত্ত্ব (১৮৮১), পশুপতি সংবাদ (১৮৮৪), কঃ পন্থা (১৮৯৮), বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি (১৮৯৯), সাবিত্রী তত্ত্ব (১৯০০) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত পুস্তক 'পশুপতি সংবাদ' পাঠকমহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলে। তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পান এবং হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা অবশ্যই 'হিন্দুত্ব' নামক পুস্তকটি। তিনি 'হিন্দুত্ব' পুস্তকটি রচনা করেন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে, বিনায়ক দামোদর সাভারকর তাঁর "Hindutva–Who is a Hindu" পুস্তকটি লেখার অনেক আগেই। যদিও একথা স্বীকার করতে হবে, সমগ্র ভারতে 'হিন্দুত্ব' ধারণাটি জনপ্রিয় করতে সাভারকরের পুস্তকটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর কারণ অবশ্যই রাজনৈতিক। সাভারকর নিজে সক্রিয় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন; তিনি হিন্দু মহাসভা দলের সভাপতি ছিলেন। ফলে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন সহজেই বিস্তারলাভ করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত খুব কম ভারতবাসী, এমনকী বাঙ্গালিও চন্দ্রনাথ বসুর 'হিন্দুত্ব' বইটি পড়েছেন। এই বইটি সম্পর্কে জানেন খুব কম মানুষ। যদিও তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রে ঊনবিংশ শতকের হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন আলোচনাসূত্রে, তার উল্লেখ কিছু গবেষক করেছেন, কিন্তু কেউই তার বিস্তারিত বিবরণ দেননি। কোনো ইংরেজি অনুবাদ, এমনকী বাংলাতেও বইটি সহজলভ্য নয়। যাইহোক, বইটি সম্পর্কে Calcutta Review পত্রিকার ১৮৯৪, জুলাই সংখ্যায় দেশীয় সাহিত্য (Vernacular Literature) বিভাগে Critical Notices নামে একটি পর্যালোচনা বেরোয়। ওই পর্যালোচনায় বলা হয়, "This is evidently a work of Hindu revival, and therefore it is desirable to give some idea of this movement." ওই পর্যালোচনায় আরও বলা হয়, "Babu Chandranath's is the first work which treats of the Hindu articles of faith. It aims at being an exposition of the deepest and abstrusest doctrines of Hinduism, not in a spirit of apology, not in a spirit of bombast, but in a calm and dispassionate spirit... Babu Chandranath has selected the noblest doctrines of Hinduism." অধুনা বিলুপ্ত ইংরেজি দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা ওই সময়ে 'হিন্দুত্ব' পুস্তকটি সম্পর্কে লিখেছিল, "The discussions are carried through out the book in strictly logical method and the author has made no attempt to hide confusion of thought by verbosity and rhetoric.The Adwaitabad elucidated and supported in a manner that would do credit to any European 'theologist or metaphysician.' doctrine which European metaphysicians have, by mistake, natural to them, called pantheistic doctrine and which has in fact been distantly echoed by thinkers like Spinoza has been. চন্দ্রনাথ বসুর আগে রাজনারায়ণ বসু, ভুদেব মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিন্দুত্ব নিয়ে লেখালেখি করেছেন। এঁদের সকলেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজনীতি তাঁরা আত্মস্থ করেছিলেন। সেই শিক্ষা থেকেই তাঁরা অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়েন নিজের দেশের অতীত অনুসন্ধানে। তাঁদের এই অনুসন্ধিৎসা থেকেই তাঁরা এক নতুন ভারত আবিষ্কার করেছিলেন। চারজন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালি চারটি বই লেখেন হিন্দুধর্মের উপর। এই গ্রন্থগুলির উপর ভিত্তি করেই বাঙ্গলায় হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুমেলার' অন্তর্ভুক্ত 'জাতীয় সভার' ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ তারিখের অধিবেশনে তাঁর যুগান্তকারী দীর্ঘ প্রবন্ধ 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' পাঠ করেন। এই দীর্ঘ প্রবন্ধই একই নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়

ইদানীংকালে কোনো কোনো মহল থেকে সোচ্চারে ঘোষণা করবার চেষ্টা হচ্ছে, বাঙ্গলার ডিএনএ-তে 'হিন্দুত্ব' নেই। কথাটা যে সর্বৈব মিথ্যে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাঙ্গলার রেনেসাঁ বা সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তিতেই আছে হিন্দুভাবনা। হিন্দুধর্মের ত্রুটিগুলো দূর করে তার সংস্কারই ছিল ওই আন্দোলনগুলির মূল প্রেরণা।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ‘বৃদ্ধ হিন্দুর আশা’ নামে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এক ‘মহা হিন্দু সমিতি’ গঠনের প্রস্তাব করেন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভা গঠনের মাধ্যমে তাঁর এই প্রস্তাব পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। তাঁর এই পুস্তিকাটি Old Hindu's Hope নামে ইংরেজিতে অনুদিত হয়েও প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘ধর্মতত্ত্ব’ লেখেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পরে, ১৮৮৮ সালে এবং ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘সামাজিক প্রবন্ধ’ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থগুলির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে ‘হিন্দুত্বের’ ধারণা। এই প্রবাহের শেষতম গ্রন্থ হলো চন্দ্রনাথ বসুর ‘হিন্দুত্ব’। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। এই পুস্তক প্রণয়ন সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় চন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘‘পূজ্যপাদ ভুদেব মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অগ্রে এই চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতে পারিয়াছি। ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধে এবং চট্টোপাধ্যায়ের ধর্মতত্ত্বে হিন্দুত্বের আলোচনা আছে।’’ যদিও তিনি ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু বা তাঁর ‘হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা’ পুস্তিকাটির উল্লেখ করেননি। তিনি ওই ভূমিকায় আরও বলেছেন, ‘‘আর একটি কথা এই, হিন্দুত্বের যে সকল লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছি, তদ্দৃষ্টে যদি হিন্দুকে অতি অসাধারণ মৌলিকতা সম্পন্ন বিরাট মনুষ্য বলা যায়, তাহা হইলে ভুল হয় না। এই অসাধারণ মৌলিকতার একটি অর্থ এই যে, ধর্মশাস্ত্র, দেবতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজপ্রণালী— কিছুরই নিমিত্ত হিন্দু কাহারো নিকট কিছুমাত্র ঋণী নয়। হিন্দুর যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার নিজের।’’

‘হিন্দুত্ব’ গ্রন্থে তিনি তাঁর হিন্দুত্ব তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন মূলত ‘অদ্বৈত-বেদান্ত’ তত্ত্ব এবং কতকগুলি মৌলিক বিষয়ের উপর। বিষয়গুলি হলো সোঽহং, লয়, নিষ্কাম ধর্ম, তুযানল, কড়াক্রান্তি, ব্রহ্মচর্য, মূর্তিপূজা, মৈত্রী ইত্যাদি বিষয়ের উপর। এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে তিনি হিন্দুত্বের লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। এই বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, হিন্দুর মনের ন্যায় সমগ্রগ্রাহী, সমগ্রব্যাপী মন পৃথিবীতে আর নাই।

ওই গ্রন্থের ‘সোঽহং’ প্রবন্ধে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, সোঽহং অর্থাৎ সেই আমি অর্থাৎ ঈশ্বরই আমি। হিন্দু ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতাবোধ করেছে। আমরা প্রিয়েরে আপন করি, আপনারে প্রিয়। উপনিষদে বলা হয়েছে, ‘আত্মানমেব প্রিয়মুপাসিত’ অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করবে। ‘একথা ভারতের হিন্দু বই আর কেহ কখন কহে নাই। এই কথা কহে বলিয়া হিন্দু হিন্দু— এই কথাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর হিন্দুধর্ম। সোঽহং হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ, হিন্দু-ধর্মের লক্ষণ।’ অন্য কোনো ধর্মে নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হয়নি; সেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মাঝে রয়েছে যোগাযোগকারী কোনো ‘গসপেল’ বা ‘রসুল’। হিন্দুরা মনে করে, জগতে শুধু আমি সেই নই— যাহা কিছু আছে, সকলই সেই, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ। এরপরে তিনি লয় অর্থাৎ অলৌকিক পৌরুষেয়তা, নিষ্কাম ধর্ম, ধ্রুব বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, তুষানল অর্থাৎ বিষম কষ্টসহিষ্ণুতা, কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতা, ব্রহ্মচর্য বা জীবনে ব্রহ্মৈকপরতা, তেত্রিশ কোটি দেবতা বা সর্বত্র ব্রহ্মদর্শিতা যেখানে বলা হয়েছে ঈশাবাস্যমিদং সর্বং জগত্যাং জগৎ, প্রতিমা বা মূর্তিপূজা (স্মর্তব্য যে, এক্ষেত্রে তিনি লিখেছেন, হিন্দুশাস্ত্রে সাকার নিরাকার উভয়বিধ পূজারই ব্যবস্থা আছে। নিরাকার পূজার ব্যবস্থা জ্ঞানীর জন্য, সাকার পূজার ব্যবস্থা আপামর জনগোষ্ঠীর জন্য), মৈত্রী অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা যার ফলে সর্বভূতে অনুরাগ জন্মে (স্মর্তব্য, আত্মবৎ সর্বভূতেষু পশ্যন্তি) ইত্যাদিকে হিন্দুত্বের সাধারণ লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। হিন্দুত্বের যে ঐতিহ্য বাঙ্গালি মননে রয়েছে তা তিনি সূত্রাকারে প্রকাশ করেছেন। তিনি এবং উদারপন্থী হিন্দু-ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভুদেব মুখোপাধ্যায় তাঁদের লেখার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুত্বের ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছেন। খ্রিস্টান, মুসলমান এবং ইংরেজি শিক্ষিতরা অভিযোগ করত যে, হিন্দু সামাজিক পরিসরে কোনো সমানতা বা সাম্য নেই। এ অভিযোগের যথার্থ উত্তর দিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। তিনি শাস্ত্র উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, হিন্দুরা সমস্ত জগতের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে, তাঁরা মনে করে ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ’; খ্রিস্টান বা ইসলামিক ধর্মশাস্ত্রে কোথাও এমন সর্বব্যাপী ঐক্যের কথা বলা হয়নি। ইংরেজি শিক্ষিত রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভুদেব মুখোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বসু হিন্দু পুনরুজ্জীবন প্রয়াসে গ্রহণ করেছিলেন যুক্তির আশ্রয়। এঁরা সবাই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। এঁদের কাছে অন্ধ ইংরেজ অনুকরণ ভীরুতা বলেই মনে হয়েছিল। ভাবাবেগ ত্যাগ করে যুক্তির সাহায্যে তাঁরা হিন্দুধর্মের মূল সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ‘হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা’ বক্তৃতার মাধ্যমে রাজনারায়ণ বসু এর প্রথম সূচনা করেন। এই প্রজ্ঞাপ্রবাহে চন্দ্রনাথ বসু শেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি হিন্দু সমাজের সবকিছু সুন্দর বলে মনে করেননি; কিছু কিছু আবর্জনাও যে আছে তা তিনি স্বীকার করতেন। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদী হলেও তিনি হিন্দুধর্মকে সংস্কারের অতীত বলে মনে করেননি। ত্রিধারা প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, ‘‘এই সকল বিষয় অনিষ্টকর কুসংস্কার নাশ করা বর্তমানকালে আমাদের সংস্কার কার্যের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।’’

ইদানীংকালে কোনো কোনো মহল থেকে সোচ্চারে ঘোষণা করবার চেষ্টা হচ্ছে, বাঙ্গলার ডিএনএ-তে ‘হিন্দুত্ব’ নেই। কথাটা যে সর্বৈব মিথ্যে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাঙ্গলার রেনেসাঁ বা সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তিতেই আছে হিন্দুভাবনা। হিন্দুধর্মের ত্রুটিগুলো দূর করে তার সংস্কারই ছিল ওই আন্দোলনগুলির মূল প্রেরণা। পরবর্তীকালের স্বাধীনতা আন্দোলনেও হিন্দু অনুষঙ্গগুলিই স্বাধীনতাকামীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। বাঙ্গলার সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকদের কাছে প্রেরণার উৎসই ছিল হিন্দুধর্ম। সেটা বারে বারে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেই চিন্তাভাবনা যে মানুষের মনে নব কলেবরে প্রস্ফুটিত হচ্ছে সেটা বোঝা প্রয়োজন। বাঙ্গলার চন্দ্রনাথ বসু ‘হিন্দুত্বে’র তাত্ত্বিক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে, আর ৩১ বৎসরের ব্যবধানে, ১৯২৩ সালে মহারাষ্ট্রের বিনায়ক দামোদর সাভারকর দিয়েছেন ‘হিন্দুত্বে’র ভৌগোলিক ব্যাখ্যা এবং রাজনৈতিক গতি। ■

বঙ্গপ্রদেশে ইংরেজ শাসনের পটভূমি

নারায়ণশঙ্কর দাশ

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পর্তুগিজ ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে জাহাজে করে বেরিয়ে পড়েন আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে দেশ আবিষ্কারের নেশায়। তারপর সেখান থেকে ১৪৯৮ সালে ভারতের কালিকটে পৌঁছোন, সঙ্গে প্রচুর মশলাপাতি ও দামি দামি অলংকার। বলা হয়ে থাকে যে Shortly after Vasco-da-Gama reached India in 1498, the Portuguese set up a trading base in Goa. এর পর-পরই ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ-১ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে একটি সনদ বা চার্টার দেন ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য করার। মধ্যযুগের সময়কালীন কর্পোরেট চার্টারের অর্থ ছিল সম্রাট, রাজা বা রানির অনুমতিক্রমে বাণিজ্যের অধিকার। এককথায় কর্পোরেট চার্টার হচ্ছে রাজা বা রানির কাছ থেকে পাওয়া এক ধরনের ব্যবসায়িক অধিকার। পাশাপাশি কর্পোরেট চার্টার ছিল রাজশক্তির ক্ষমতা অপব্যবহারের এক প্রাতিষ্ঠানিক হাতিয়ার। যেমন ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ-১ কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত চার্টার বা সনদ ছিল কর্পোরেট চার্টার। ভারতীয় উপনিবেশ অর্থনীতির ওপরে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা প্রযুক্ত করেছিল। এর ফলে সুরাট, মাদ্রাজ, বোম্বে এবং কলকাতায় ইংরেজদের ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। জানা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৫১ সালে তাঁদের প্রথম কুঠি স্থাপন করে বাংলাদেশে। এদিকে ফরাসিরা ১৬৬৮ সালে তাঁদেরও কুঠি স্থাপন করে পণ্ডিচেরীতে। এরপর ১৬৮২ সালে উইলিয়ম হেজেস্ যখন ইংরেজ কোম্পানির প্রথম গভর্নর ও এজেন্ট হিসেবে হুগলী এসে পৌঁছোন, তখন দেখেন মোগল রাজপুরুষদের খাই এত বেড়ে গেছে যে ব্যবসা বাণিজ্যের হাল খুব সঙ্গিন হয়ে পড়ছে। ফলে "The administration of Black Zaminder had been more beneficial to himself than to them." একটা কথা প্রচলিত আছে যে বঙ্গপ্রদেশে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার অধিকার ইংরেজরা পেয়েছিল ব্রাউটন নামে একজন দেশওয়ালি চিকিৎসকের দৌলতে। মোগল বাদশা শাহজাহান তখন অসুস্থ। শুরু হয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব, দিল্লির মসনদ নিয়ে ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম। বিহারের মুঙ্গের থেকে সুজা ফৌজ নিয়ে ছুটলেন দিল্লির দিকে। এলাহাবাদ পেরোতে না পেরোতেই রুখে দাঁড়ালো ঔরঙ্গজেবের বিরাট ফৌজ। লড়াইয়ে হেরে গিয়ে সুজা ডেরা গাড়লেন বাঙ্গলায়। ততক্ষণে দিল্লির মসনদ দখল করেছেন ঔরঙ্গজেব। বন্দি করেছেন বৃদ্ধ পিতাকে আগ্রায়। সুজার হাল সঙ্গিন। আহা! লোকের মতো লোক হলেন সুলতান সুজা। বণিক ইংরেজদের ওপর ভারী সদয়। হবেন নাই বা কেন? একটা কৃতজ্ঞতাবোধ তো আছে। তাঁর প্রিয় বোন জাহানারার পোশাকে একবার আগুন ধরে গেল। দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। অতিকষ্টে যখন আগুন নিভলো, শাহজাদির তখন অন্তিমকাল। অগর হাকিম বৈদ্য হার মানলো। বুঝি জীবনের আর কোনো আশা নেই। গুজরাটের সুরাটে খবর গেল। ডাক পড়লো ডাঃ গেব্রিয়েল ব্রাউটনের। জাহাজের ইংরেজ সার্জেন। সুরাট থেকে আগ্রা। তাঁর চিকিৎসায় শাহজাদি সুস্থ হলেন। সুলতান সুজা খুশি মনে ডাঃ ব্রাউটনকে নিয়ে এলেন রাজমহলে। দিতে চাইলেন ইনাম। সুসভ্য ইংরেজ সন্তান ডাঃ ব্রাউটন নিজের জন্য কিছুই চাইলেন না। চাইলেন স্বজাতি ইংরেজদের জন্য নিশান। ব্যবসায়ের ছাড়পত্র। যার তিন হাজার টাকা বার্ষিক করের বিনিময়ে ইংরেজ বণিকরা পেল ওড়িশা, বাঙ্গলায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার। বিনা শুল্কে। এটা সুলতান সুজারই দান। আর ইংরেজ ডাক্তার গেব্রিয়েল ব্রাউটন দেখালেন, স্বজাতিপ্রেম কাকে বলে।

এই কাহিনির সত্যাসত্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও একথা ঠিক, ডাঃ ব্রাউটন তৎকালীন বাঙ্গলার সুবেদার শাহ সুজার পত্নীর রোগ নিরাময় করেছিলেন এবং সেই সূত্রে তাঁর কাছ থেকে আদায় করেছিলেন হুগলী বালেশ্বরে কুঠি স্থাপনের অনুমতি। অনুমতি বার্ষিক তিন হাজার টাকা শুল্ক দিয়ে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করার অধিকার। এদিকে কলকাতার জনক জব চার্নকের সুতানুটি ডায়েরি থেকে জানা যায় যে তিনি ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট। তিনি প্রথমবার সুতানুটি এসেছিলেন ১৬৮৬ সালের ২০ ডিসেম্বর। হুগলী থেকে তাড়া খেয়ে। দ্বিতীয়বার আসেন ১৬৮৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। উলুবেড়িয়া থেকে। তাঁর তৃতীয়বার প্রত্যাবর্তন ২৪ আগস্ট ১৬৯০ সাল। তিনি তাঁর লগবুকে লিখে গেছেন— ''২৪ আগস্ট ১৬৯০, আজ সাঁকরাইল পৌঁছে ক্যাপ্টেন ব্রুককে আদেশ দিলাম তাঁর জাহাজ নিয়ে সুতানুটি যেতে। আমরা সেখানে পৌঁছালাম মধ্যাহ্নে। কিন্তু পৌঁছে দেখি, জায়গাটার অবস্থা শোচনীয়। আমাদের মাথা গোঁজবার মতো কোনো ঠাঁই আর অবশিষ্ট নেই। এদিকে দিনরাত বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হলো নৌকায়।'' এরপর থেকে তিনি থেকে যান এখানেই। সুতরাং ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্টকেই ধরা হয় কলকাতার জন্মদিন। যাইহোক, ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে নবাব আজিম উস্সানের ছেলে ফারুকসিয়রকে ১৬ হাজার টাকা উপঢৌকন অর্থাৎ ঘুষ জুগিয়ে আরমানি সদাগর খোজা সরহাদের ওকালতিতে নবাবপুত্রের অনুমতি আদায় করে সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা— এই তিনটি ভিন্নমতে ১৬ শো টাকায়। জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের তখন পড়তির দশা। ইংরেজরা ছিলেন সদাগর, হয়ে গেল বণিক। এদিকে ১৭০০ সাল নাগাদ ভারতের অভ্যন্তরে নানারকম বিদ্রোহ মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করতে থাকলো। পাশাপাশি, ফরাসি এবং ইংরেজরা ভারতের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য নিজেদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। পাশাপাশি বাঙ্গলায় ওলন্দাজ, পর্তুগিজ প্রভৃতি বণিকদের তুলনায় ইংরেজ বণিকদের রমরমা। কারণ ইতিমধ্যেই ইংরেজরা ডাঃ গেব্রিয়েলের সুবাদে বাঙ্গলায় নিঃশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পেয়ে গেছে। অপরদিকে বাঙ্গলার নবাব সিরাজদৌল্লা ইংরেজ বণিকদের কলকাতায় বাড়বাড়ন্ত দেখে মুর্শিদাবাদ থেকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে কলকাতায় আসেন এবং ১৭৫৬ সালের ২০ জুন রবার্ট ক্লাইভ-সহ ইংরেজদের কলকাতা থেকে সমূলে বিতাড়ন করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামিক রীতি অনুযায়ী কলকাতার নাম পাল্টে নামকরণ করেন আলিনগর।

প্রায় একই সময়ে বাঙ্গলার নবাব সিরাজ ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটিরও দখল নেন। আমরা অতুলকৃষ্ণ রায়ের 'কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' থেকে জানা যায় যে, শোভা সিংহের বিদ্রোহ আর তাঁর আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ইংরেজরা নবাবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন দুর্গ গড়ার অধিকারের। নবাব দুর্গ গড়ার হুকুম দেননি। শুধু বলেছিলেন নিজের কুঠি রক্ষা করার জন্যে ব্যবস্থা নিতে পার। ব্যস, এটুকু অনুমতিতেই ইংরেজরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ গড়ার। ১৬৯৭ সালের জানুয়ারির মধ্যে কাজ এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে তখনকার মতো ব্যবহারের জন্য মাদ্রাজ থেকে দশটি কামান আনা হয়েছিল। ১৭০০ সালের ২০ আগস্ট তদানীন্তন ইংল্যান্ড রাজ্যের নামানুসারে দুর্গটির নামকরণ করা হয়েছিল 'ফোর্ট উইলিয়াম'। আবার এটাও জানা যায় যে ''In 1696, Old Fort William was named after king Wiliam III'' ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দুটি রক্ষণপ্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রথমটি পূর্ব-উত্তরে এবং দ্বিতীয়টি দক্ষিণ পূর্বে। সে বছরই মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইংরেজগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পূর্বনির্মিত রক্ষণপ্রাচীরের সম্মুখভাগে নদীর তীরে আরো দুটি রক্ষণপ্রাচীর নির্মাণ করে নেয়। ১৭১০ সালের মধ্যে এই ফোর্ট উইলিয়াম মোটামুটি চতুষ্কোণ প্রাপ্ত হয়।

সিরাজদৌল্লা ফিরে যান মুর্শিদাবাদ। সিরাজের এই জয়ে কিন্তু মিরজাফর ক্ষুণ্ণ। ইংরেজরা শঙ্কিত। আঞ্চলিক, জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সিদ্ধহস্ত ইংরেজরা সিরাজের ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছিল ফলতায়। কেবলই সেখানে ছিল সেনাবাহিনীর লোক। তারপর একে একে ফিরতে লাগলো সবাই। ইতিমধ্যে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হলো সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার। মিরজাফর হবেন বাঙ্গলার নতুন নবাব। তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের গোপনে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলো। এইভাবে তৈরি হলো পলাশী যুদ্ধের পটভূমি। মিরজাফর গোপনে যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন ইংরেজদের সঙ্গে পয়গম্বরের নামে শপথ করে, তার বহু শর্তের মধ্যে কয়েকটি ছিল এইরকম : ''সিরাজদৌল্লার কলিকাতা অধিকার ও লুণ্ঠনের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণের জন্য আমি ইংরেজগণকে এক কোটি টাকা দিব। এছাড়া কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসীগণের যে সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিতেছি। এছাড়াও দেশীয়গণের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণের জন্য ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে।'' তারপর অর্থাৎ In 1757 almost 3000 British Soldiers, led by the East India Company's Robert Clive, defeated an army of over 50,000 French and Indian troops at the battle of Plassey. পলাশীর যুদ্ধ শেষে সিরাজকে হত্যা করা হলো। কেননা শত্রুর শেষ রাখতে নেই তা ব্রিটিশদের ভালোমতোই জানা। ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারি ইংরেজরা বিনা বাধায় কলকাতা পুনরুদ্ধার করে। এরপর ব্রিটিশরা আলিনগরের নাম পাল্টে পুনরায় রাখে কলকাতা। মিরজাফর নবাব সাজলেন। লুঠ করা হলো সিরাজের ধনভাণ্ডার। তাতে ছিল ১ কোটি ৭৬ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা। বত্রিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। দু' সিন্দুক বোঝাই সোনার পাত। চার সিন্দুক মণিমুক্তো ও অলংকার। দুটি ছোটো সিন্দুকে ভর্তি জহরত। সে সব টাকা দুহাতে নিজেরাই ভাগ করেন নিলেন ক্লাইভ, ড্রেক, ওয়্যাটস্, কিলপ্যাট্রিক, ম্যানিংহামেরা। এ যুদ্ধ জেতার কিছুদিন বাদেই মিরজাফরকে সরিয়ে ইংরেজরা প্রযুক্ত করেছিল কর্পোরেট চার্টার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে। তা প্রযুক্ত হয়েছিল কেবল বাঙ্গলা, বিহার ও ওড়িশায়। ভারতের দিল্লির মসনদ তখনও মোগল সম্রাটের অধীন, ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট মোগল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ইংরেজরা বাঙ্গলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করে। ১৭৭২ সাল ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতাকে করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা ছিল কার্যত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধীনস্থ বাঙ্গলা, বিহার ও ওড়িশার রাজধানী। দিল্লির সিংহাসনে আসীন তখনও মোগল সম্রাট। ■

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত

রঞ্জন কুমার দে

চারদিকে চলছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের পক্ষে-বিপক্ষে মিটিং মিছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অতীতে যারা ধারা ৩৭০, ৩৫(এ)-র পক্ষে ছিলেন, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে সংশয়, তিন তালাক বিলে অনীহা, ইভিএম, রাফাল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে গুজব তৈরির প্রয়াস চালিয়েছিলেন তাঁরাই এখন নতুন ঢঙে CAA, NRC, NPR নিয়ে সংবিধান বিরোধী খেলায় নেমেছেন। প্রত্যেকটি দেশের নির্বাচিত সরকার নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় জনগণের স্বার্থে বৃহৎ সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ-সহ আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানেও নাগরিকপঞ্জী আছে। উল্লেখ্য যে মায়ানমারের রোহিঙ্গা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে বাংলাদেশ সম্প্রতি নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুত করতে বাধ্য হয়েছে। তাহলে ভারত কি নিজের দেশের সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী বা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বাস্তবায়ন করতে পারে না? ২০১৯ লোকসভায় জনগণের আশীর্বাদ স্পষ্ট করেছে গত সরকারের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সঠিক এবং সময়োপযোগী ছিল—সেটা জিএসটি হোক কিংবা নোটবন্দি। তেমনিভাবে খুব কম সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় সরকারে আমরা দেখতে পেয়েছি তিন তালাক বিল, রামমন্দিরের সুরাহা, সংশোধনী নাগরিকত্ব বিল যা খুবই প্রশংসনীয়। বিশেষত এখন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে রাজপথে যে তাণ্ডব চালানোর প্রয়াস চলছে তাতে স্পষ্টভাবে বলা যায় এক বিশেষ গোষ্ঠীর হতাশার বহিঃপ্রকাশ, যারা মন থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ, তিন তালাকে নিষেধাজ্ঞা এবং সুপ্রিম কোর্টের রামমন্দিরের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। যাই হোক, উত্তর প্রদেশ সরকার, অসম সরকার কড়া হাতে যেভাবে এই জেহাদিদের দমন করেছে, মমতার ঠিক উল্টো। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের জন্য পশ্চিমবঙ্গে জ্বালানো হয়েছে কয়েকশো কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্রোহীদের ইতিমধ্যে বিদেশি জেহাদি সংগঠন থেকে আর্থিক লেনদেনের স্পষ্ট প্রমাণ সরকার পেয়েছে। এই সিলেক্টিভ বিদ্রোহ দেখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কয়েক ধাপ এগিয়ে বলে দিয়েছেন সরকার এক চুলও সরছে না। প্রধানমন্ত্রী মোদী বিরোধীদের উদ্দেশে বলতে বাধ্য হয়েছেন তারা যদি এভাবে একবার হলেও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জন্য রাজপথে নামতেন!

প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের কিছু পরেই দেখা যায় পাকিস্তানের ঐতিহাসিক নানকানা সাহিব গুরুদ্বারে মৌলবাদীদের আক্রমণ। তাদের দাবি গুরুদ্বারটি বদলে করতে হবে গুলাম-ই-মুস্তাফা, শিখদের বদলে থাকবে এখানে মুসলমানরা। এই শিখ সম্প্রদায়ের শুধু অপরাধ ছিল তারা এক শিখ তরুণী জগজিৎ কৌরের জবরদস্তি ধর্মান্তকরণের প্রতিবাদ করেছিলেন মাত্র। গুরুদ্বার কাণ্ডের পরপরই প্রকাশ্যে দিনদুপুরে রাস্তায় পেশোয়ারে পরবিন্দর নামের এক যুবককে খুন করা হয়। পাকিস্তানে সাধারণ সংখ্যালঘু থেকে শুরু করে ভিআইপিরাও নিরাপত্তাহীনতা এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে জর্জরিত। সেদিন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান টিমে তাঁর প্রতি বৈষম্য করা হতো, এমনকী সতীর্থদের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়ারও অধিকার

ছিল না যেটা সতীর্থ শোয়েব আক্তার খোদ অকপটে স্বীকারও করেছেন। পাকিস্তানের প্রথম হিন্দু ক্রিকেটার অনিল দলপতও অভিযোগ করেছেন ১৭ বছর আগে শুধু সংখ্যালঘু হিন্দু হওয়ার অপরাধে ইমরান খানের রোষানলে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহার সম্পূর্ণ ক্রিকেট কেরিয়ার। শুধু জাতীয় দলের সংখ্যালঘু ক্রিকেটার নয়, ভালো নেই দেশের সংখ্যালঘু বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রীরাও। প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতিবেশী দেশের সংখ্যালঘু প্রীতির বার্তায় এবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দলের খাইবার পাখতুনের প্রাক্তন বিধায়ক বলদেব কুমার আশ্রয় নিতে মোদী সরকারের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁর চোখের সামনে পাকিস্তানে প্রচুর সংখ্যায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অপহরণ, ধর্মান্তকরণ, ধর্ষণ, খুন করা হচ্ছে, সুতরাং এমতাবস্থায় তিনি আর সেখানে ফিরতে চান না। বেনজির ভুট্টোর শাসনকালে পাঞ্জাব প্রদেশের প্রাক্তন সাংসদ দিব্যরাম অত্যাচারিত হয়ে ২০০২ সাল থেকে সপরিবারে ভারতের হরিয়ানায় শরণার্থী হয়ে বাদাম বিক্রি করছেন। প্রাক্তন এই সাংসদ আক্ষেপের সুরে জানান তিনি সাংসদ হয়েও নিজের এলাকায় সংখ্যালঘু মেয়েদের ধর্ষণ, অপহরণ এবং ধর্মান্তকরণ রুখতে পারেননি। মৌলবাদীরা তাঁর শ্যালকের দুই মেয়েকে রাতের অন্ধকারে অপহরণ করে ধর্মান্তরিত করেছে। সাংসদ বারংবার প্রশাসনকে জানালেও কোনও লাভ হয়নি, কয়েকদিন পর ওই দুই মেয়ের লাশ বাড়ির পাশেই পাওয়া যায়। সাংসদকে যে কাপে চা দেওয়া হতো সংখ্যালঘু হওয়ার অপরাধে সেই কাপটা ভেঙে ফেলা হতো এবং কাপের দামটাও তাঁর কাছ থেকে আদায় করা হতো। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই সংখ্যালঘুদের করুণ অবস্থা অব্যাহত। সংখ্যালঘু শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রার্থনার বদলে কলমা পড়ানো, শিশুদের কচিকাঁচা মনে অমুসলমানদের জন্য হিংসার বীজ বপন, নামাজ পড়ানো, হিজাব পরানো প্রভৃতি এখন আরও ক্ষিপ্রতর হয়ে উঠেছে। শাখা-সিঁদুর পরা, হোলি, দীপাবলি উদ্‌যাপন প্রভৃতি পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুদের মর্জিতেই করা যায়। পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল একজন দলিত ও অবিভক্ত ভারতবর্ষের নেতা ছিলেন। ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার সাধ মিটলেও দলিত হিন্দু হওয়ার অপরাধে খোদ মন্ত্রী হয়েও রাতের অন্ধকারে সপরিবারে আবার ভারতে ফিরতে বাধ্য হন।

পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্মান্তকরণ এবং হত্যার সেই ট্র্যাডিশন এখনও অব্যাহত। পাকিস্তানের একটি ইংরেজি সংবাদপত্র 'Express Tribunes'-এর মতে প্রতি বছর প্রায় ১২৫০ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু মেয়েকে বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তকরণ করা হয়। সম্প্রতি অনিলা ধাওয়ান নামের ১৭ বছরের এক গরিব নাবালিকাকে তার বাবার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে যথারীতি ধর্ষণ, ধর্মান্তকরণ এবং অবশেষে পঞ্চাশোর্ধ এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় যার দুজন বিবি রয়েছে। সেখানকার আরেক সংবাদপত্র Asia News-এর একটি প্রতিবেদন জানায় পুরো একটি খ্রিস্টান পরিবারকে মৌলবাদীরা হত্যা করে, কারণ তারা ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে চায়নি। পাকিস্তানের ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে শুধু হিন্দু প্রায় ২০ শতাংশ ছিল কিন্তু ১৯৯৮ সালের গণনানুযায়ী সেই সংখ্যা ২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ২০১৯ এর ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার তালিকায় পাকিস্তানকে ব্ল্যাকলিস্টেড করেছে। ব্লাসফেমি বা 'ধর্ম অবমাননা' পাকিস্তানের অন্যতম জঘন্য আইন। আগে পাকিস্তানে ব্লাসফেমি আইনে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড ছিল কিন্তু ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে সেনাশাসক জিয়াউল হক ব্লাসফেমি আইনে কয়েকটি নতুন ধারা সংযোজন করে এই আইনকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাস করেছে। এখনও পর্যন্ত ব্লাসফেমি আইনে পাকিস্তানে চল্লিশজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, কয়েকমাস আগে আসিয়া বিবি নামের এক ক্রিস্টান মহিলাকে ব্লাসফেমি আইনে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল, এখন আবার জুনাইদ হাফিজ নামের ৩০ বছরের এক তরুণ অধ্যাপককে ধর্ম অবমাননার দায়ে পাকিস্তান আদালত ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে।

পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের হিসেব অনুযায়ী ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত শুধু সিন্ধ প্রদেশে মোট ৭৪৩০ জন মহিলা যুবতীকে অপহরণ করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। কিছুদিন আগেও পাকিস্তানের লারকানায় হিন্দুযুবতী ডাক্তার নিমরিতা চান্দরানিকে হোস্টেলে ধর্ষণ করে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়। ঠিক তেমনিভাবে ভুগতে হয়েছে রেনো কুমারী, চান্দ্রী কোহলি, বাগরি, অঞ্জলি মেঘওয়ার, কিরণ কুমারী-সহ অগণিত হতভাগীকে। পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জবরদস্তি ধর্মান্তকরণ রোধে নন্দ কুমার নামে সিন্ধ প্রদেশের এক সেনেট সদস্য একটি বিল পেশ করেছিলেন কিন্তু গভর্নর সাইদুজ্জামান সিদ্দিকি বিলটি ইসলামের পরিপন্থী বলে সেটি বাতিল করে দেন। একইভাবে পাকিস্তানের এক খ্রিস্টান সাংসদ ড. নবিদ আমির জীবা সংবিধানের ৪১ এবং ৯১ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে দেশের অমুসলমানদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির পদ প্রশস্ত করার জন্য এক বিল প্রস্তাব করেন। কিন্তু রাজ্যমন্ত্রী আলি মোহাম্মদ সহ সংসদের বাকি সব সদস্য প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেন, পাকিস্তান একটি ইসলামিক দেশ, তাই কোনও অমুসলমান প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। সংখ্যালঘু বিদ্বেষে পাকিস্তানে ২০১৭ সালের জনগণনায় শিখদের সংখ্যা কমে আট হাজার হয়েছে যেটি ২০০২ সালে চল্লিশ হাজার ছিল। নিজ দেশের এই সংখ্যালঘু নিধন যজ্ঞের পরেও পাক প্রধান রাষ্ট্রসঙ্ঘ দাঁড়িয়ে ভারতকে অসহিষ্ণুতার পাঠ শেখান, ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, এনআরসি, এনআরপি এমনকী জেএনইউ ইস্যুতেও এই নির্লজ্জরা নাক গলাতে দ্বিধাবোধ করে না। ভারত এমন এক অপরিপক্ব প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে যিনি কাশ্মীরের ৩৭০, ৩৫(এ)-র ইস্যুতেও জেহাদের উস্কানি দেন। প্রতিবেশী দেশগুলোর সংখ্যালঘু উৎপীড়ন রোধে অনেক আগেই নাগরিকত্ব সংশোধন আইন কার্যকরী করা জরুরি ছিল। তাই প্রধানমন্ত্রী বারংবার রাজনৈতিক বিরোধীদের রাজপথে আন্দোলন করার চেয়ে প্রতিবেশী দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য মানবতার স্বার্থে আওয়াজ তুলতে আহ্বান করছেন। ■

মরিচঝাঁপি গণহত্যা হলো বামজমানার আদি পাপ

রুদ্রাক্ষ বসু

মরিচঝাঁপি নিয়ে কিছু লিখতে গেলে বা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের নিষ্ঠুর পরিণতির কথা, মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হয়ে জন্মভূমি হারানো উদ্বাস্তু মানুষগুলির দণ্ডকারণ্যের করুণ জীবনের কথা। কারণ মরিচঝাঁপির জঠরে লুকিয়ে আছে উদ্বাস্তু মানুষগুলির নিষ্ঠুর জীবন কাহিনি।

প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর ভাষাতেই বলতে হয়, দেশভাগের অপরিণামদর্শিতার গর্ভের সন্তান দণ্ডকারণ্য। আর দণ্ডকের সীমাহীন অন্যায় ও অবিচারের গর্ভে জন্ম মরিচঝাঁপি। দেশভাগ যদি হয় অখণ্ড ভারতের রাজনীতিবিদদের পাপ, তবে মরিচঝাঁপি হলো পশ্চিমবঙ্গের বামজমানার আদি পাপ।

সেদিন দেশভাগের বলি উদ্বাস্তু মানুষগুলিকে সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে ক্ষমতাপিপাসু আমাদের নেতারা তাদের দায় ঝেড়ে ফেলেছিলেন, সেইদিনই কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মরিচঝাঁপির বীজ বপন করা হয়েছিল। দণ্ডকারণ্যে নির্বাসনে পাঠাবার সময় আমাদের নেতারা একটি বারের জন্য ভেবে দেখেননি বা সত্যি কথা বলতে গেলে ভাবার প্রয়োজন বোধ করেননি যে মূলত নরম আর্দ্র জল-হাওয়ার পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষগুলো, মূলত যারা কৃষিজীবী দণ্ডকারণ্যের বালি, পাথরের রুক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের পক্ষে কি আদৌ বেঁচে থাকা সম্ভব? এই প্রান্তিক কৃষিজীবী মানুষগুলির পক্ষে দণ্ডকে যে জীবনধারণ অসম্ভব এবং দণ্ডকের পুনর্বাসন যে কখনও সফল হওয়া সম্ভব নয়, তা কিন্তু সেই সময়ই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের সচিব হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এবং তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, ওই উদ্বাস্তু মানুষদের যেন তাদের বসবাসের এবং জীবিকার উপযোগী সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। দণ্ডক সম্পর্কে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী যে কতটা সত্য ছিল, পরবর্তীকালে মরিচঝাঁপির ঘটনাই তা প্রমাণ করে।

দণ্ডকের রুক্ষ পাথুরে জমি, দীর্ঘ অনাবৃষ্টি,

অনেক চেষ্টা করেও ফসল ফলাতে ব্যর্থ হওয়া, মাঝে মধ্যেই স্থানীয় জনজাতি মানুষের সঙ্গে সংঘাত, পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর অত্যাচার, পরিবারের স্ত্রী ও মেয়েদের পুলিশ দ্বারা সম্ভ্রম নষ্ট এবং সর্বোপরি নিজেদের সংস্কৃতি বিপন্নতার ভয়ে সেই ১৯৫৮ সাল থেকেই দণ্ডকের উদ্বাস্তুরা যখনই সুযোগ পেয়েছে ছোট ছোট দলে দণ্ডক ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছে।

১৯৭৬ সালের ২৫ জানুয়ারি বামফ্রন্টের তথাকথিত মহান নেতা জ্যোতি বসু দণ্ডকারণ্যের সবথেকে বড় উদ্বাস্তু শিবির মানা ক্যাম্পের কাছেই ভিলাই শহরে এক বিরাট জনসভায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, আপনারা আমাদের ভোট দিয়ে কেন্দ্রে আমাদের শক্তিশালী করুন। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত আপনাদের এই অবস্থার পরিবর্তন হবে না। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেছিলেন আমরা ক্ষমতায় এলে উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনে বসতি স্থাপনের ন্যায্য দাবি অবশ্যই মানা হবে। অবশেষে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। সারা ভারত উদ্বাস্তু সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সমর মুখার্জি, হরিদাস মিত্র, রাম চ্যাটার্জি, কিরণময় নন্দ, জম্বুবন্ত রাও ধোতে উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনে চলে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ সেদিন বলেছিলেন, আপনারা সব তৈরি থাকুন, আমরা ডাকলেই আপনারা বেরিয়ে পড়বেন। কিরণময় নন্দ মালকানগিরির সভা থেকে বললেন, আপনারা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসুন, পাঁচকোটি বাঙ্গালির দশকোটি হাত আপনাদের অভ্যর্থনা জানাবে। সুতরাং সেদিনের ওই উদ্বাস্তু মানুষগুলির সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে চলে আসার কিন্তু একটা ইতিহাস আছে। শেষপর্যন্ত ১৯৭৭ সালের শেষের দিকে দণ্ডক বাস্তুহারা উন্নয়নশীল সমিতির পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিমন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি ও উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতা সতীশ মণ্ডল একটি সভার আয়োজন করেন এবং ওই সভায় উদ্বাস্তুদের দণ্ডকের জীবনের অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার নিয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি প্রতিশ্রুতিও দেন। সেদিন পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু দরদি সরকারের একজন মন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি পেয়েই স্বভূমে ফিরতে মরিয়া উদ্বাস্তুরা সতীশ মণ্ডলের নেতৃত্বে আওয়াজ তুলল, 'চলো সুন্দরবন চলো। মরবো তো বাঙ্গলার মাটিতেই মরবো', সেই শুরু হলো ঘরে ফেরার পালা। ১৯৭৮ সালের প্রথমদিক থেকেই উদ্বাস্তুর দল দণ্ডক থেকে ধেয়ে আসে বাঁধভাঙা বন্যার জলের মতো হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ হয়ে সুন্দরবনের জনমানবশূন্য ঝোপঝাড়, কাদা ও নোনাজল বেষ্টিত মরিচঝাঁপি দ্বীপে।

এই মরিচঝাঁপি হলো রায়মঙ্গল ও বাগনা নদীর পলি দ্বারা সৃষ্টি এক দ্বীপ। সুন্দরবনের শেষ জনবসতি কুমিরমারি দ্বীপের ঠিক বিপরীতে মরিচঝাঁপি। যাকে বলে সুন্দরবনের চৌকাঠ। অর্থাৎ মূল বন্য জগৎ ও মনুষ্য জগতের মধ্যে এক বাফার এলাকা।

অল্পকিছুদিনের মধ্যেই এই দেশ হারানো মানুষগুলো আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে পেরে গড়ে তুলল তাদের স্বপ্নের এক জনপদ। নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে তৈরি করল কাঁচা পথ-ঘাট, উঁচু বাঁধ দিয়ে মাছচাষের ব্যাবস্থা। নৌকা তৈরির কারখানা, পাউরুটির কারখানা, কামারশালা, কুমোরশালা, বিশ্রামের জায়গা, আর নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য গড়ে তুলল বিদ্যালয়। যার নাম নেতাজী নগর বিদ্যাপীঠ। এই জনপদটি

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্মরণে নাম দেওয়া হয়েছিল নেতাজী নগর।

যে বামপন্থীরা এক সময় ছিল এই উদ্বাস্তুদের প্রধান বন্ধু, ত্রাতা, যাদের সংগঠনের মূল ভিত্তিই ছিল উদ্বাস্তু মানুষ, যারা উদ্বাস্তু মানুষদের আন্দামানে পুনর্বাসনের বিরোধিতা করে আর একটা নতুন বঙ্গভূমি সৃষ্টিতে বাধা দিয়েছিল। উদ্বাস্তু মানুষদের বিপথে চালিত করে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিয়েছিল। সেই বামপন্থীদের আশ্বাসে ও প্ররোচনায় এই পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে বাঁচতে এসে দণ্ডকের উদ্বাস্তু মানুষেরা খুন হলো জনদরদি বামফ্রন্ট সরকারের হাতে।

জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার কিছুতেই সমাজের 'ছোটোলোকের দল' এই উদ্বাস্তু মানুষগুলিকে পশ্চিমবঙ্গে থাকতে দিতে চাইল না। জোর করে আবার তাদের দণ্ডকে ফেরত পাঠাবার সবরকম ব্যবস্থা করতে থাকল। খাবারের জোগান বন্ধ করে, পানীয় জল বন্ধ করে মানুষগুলিকে ভাতে মারার চেষ্টা চলল। মরিচঝাঁপিতে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। তবুও সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কিছু সাংবাদিক মরিচঝাঁপির আসল চিত্র প্রকাশ করলে সভ্যসমাজ সেদিন আঁতকে উঠল। বহু বিদ্বজ্জন ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞানীগুণী মানুষ প্রতিবাদে শামিল হয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে ওই উদ্বাস্তু মানুষগুলির উপর অত্যাচার বন্ধের আবেদন করলেও ক্ষমতার দম্ভে বলীয়ান বামফ্রন্ট সরকার কোনো আবেদনে কান না দিয়ে উলটে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। একদিকে সরকারি অত্যাচার, অন্যদিকে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা দুই মিলে অভুক্ত মানুষের মৃত্যুর মিছিল দিন দিন দীর্ঘ হলো। বৃদ্ধ ও শিশুমৃত্যু এই মিছিলের দীর্ঘতা আরও প্রসারিত করে চলল। রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা খাদ্য ও ওষুধপত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ত্রাণকার্যে। এখানে একটা কথা বলা দরকার। আজকের আমাদের সবার কাছে যিনি বিশ্বজননী, দরিদ্র এবং আর্তের ত্রাতা সেই মাদার টেরেসা কিন্তু ওই অসহায় মানুষগুলির পাশে দাঁড়াবার কথা দিয়েও কথা রাখেননি। অর্থাৎ কোনও এক অদৃশ্য কারণে সাহায্যের হাত সরিয়ে নিয়েছিলেন।

কুমিরমারির মানুষ কিন্তু তাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কুমিরমারির মানুষেরা মরিচঝাঁপির অসহায় মানুষদের উপর এই অবর্ণনীয় অত্যাচার কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তার অবশ্য একটা আত্মিক কারণ আছে। কারণ উভয়েই ছিল মূলত অবিভক্ত ভারতের যশোর, খুলনা ও বরিশালের নিম্নবর্গের নমঃশূদ্র সমাজের প্রান্তিক মানুষ।

মরিচঝাঁপির মানুষেরা সেদিন কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের থেকে বেঁচে থাকার কোনো সাহায্য চায়নি। তারা নিজেদের চেষ্টায় আর অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজেদের বাঁচার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছিল। তবুও বাঙ্গালি হয়েও এই পশ্চিমবঙ্গে তাদের ঠাঁই হয়নি।

জ্যোতি বসুর সর্বহারার বাম সরকার শত চেষ্টা করেও যখন অদম্য বাঁচার ইচ্ছা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা মরিচঝাপির মানুষগুলির মনোবল ধ্বংস করতে পারল না, তখন ১৯৭৮ সালের ১৯ আগস্ট প্রচুর সংখ্যায় পুলিশবাহিনী দিয়ে লঞ্চের সাহায্যে সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় গোটা মরিচঝাপি দ্বীপকে অবরোধ করা হলো। তা সত্ত্বেও ওই ছোটোলোকের দল মানুষগুলিকে দমাতে না পেরে অবশেষে ৬ সেপ্টেম্বর পুলিশের লঞ্চ উদ্বাস্তুদের বেঁচে থাকার রসদ ও খাদ্যসামগ্রী বোঝাই প্রায় ২০০টি লঞ্চকে নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিল। দ্বীপের বাইরের কোনো মানুষ যেন কিছুতেই খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বাঁচার উপকরণ নিয়ে মরিচঝাপিতে ঢুকতে না পারে তার সবরকম ব্যবস্থা করা হলো। জ্যোতি বসু বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী ও বিরোধীদের সব তথ্য অস্বীকার করে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, এই উদ্বাস্তু মানুষগুলিকে কোনও মতেই এই পশ্চিমবঙ্গে থাকতে দেওয়া চলবে না। কারণ তারা মনে করেন মরিচঝাঁপির ওই মানুষেরা রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এরা শুধু চোরাচালানকারী নয়, সংরক্ষিত বনাঞ্চলকেও ধ্বংস করে চলেছে। এরা বাম সরকারের স্থিতিশীলতা নষ্টকারী শক্তি। এরপর শুরু হলো মরিচঝাঁপিকে উদ্বাস্তু শূন্য করার চূড়ান্ত অভিযান। ১৯৭৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর মরিচঝাপিতে প্রথম ১৪৪ ধারা জারি করা হলো। এই ১৪৪ ধারা যে শুধু জাতীয় জন আইন বিরোধী ছিল তা নয়, এটা ছিল আন্তর্জাতিক জনআইন বিরোধীও।

অবরুদ্ধ দ্বীপে চলল মৃত্যুর মিছিল। মানুষ ক্ষিদের জ্বালায় নারকেল গাছের কচিপাতা এবং যদুপালং নামে এক ধরনের ঘাস খেতে থাকল। একদিকে এসপি অমিয় সামন্তের নেতৃত্বে পুলিশ ও পুলিশের পোশাকে গুন্ডা বাহিনীর অত্যাচার, অন্যদিকে অনাহার, মৃত্যু যেন মানুষের শিয়রে এসে দাঁড়াল। অবশেষে ১৯৭৯ সালের ১৩ মে ভোর রাত্রে শুরু হলো চূড়ান্ত পর্যায়ে উচ্ছেদ অভিযান। মরিচঝাঁপির সমস্ত বাড়ি-ঘর, বাজার-দোকান এমনকী স্কুলেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। মরিচঝাঁপির উল্টদিক থেকে অসহায়ের মতো কুমিরমারির মানুষেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল জতুগৃহের মতো গোটা মরিচঝাঁপির জনপদকে আগুনের গ্রাসে ভস্মীভূত হতে। মানুষ প্রাণ বাঁচাতে পালাতে গেলে ছুটে এসেছিল ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশের গুলি। ২৪-৩১ জানুয়ারি এই আটদিন চলল নরসংহার। পুলিশের গুলি থেকে বাঁচতে কত যে মানুষ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে অতলজলে তলিয়ে গেল তা অজানাই রয়ে গেল। মৃত ও অর্ধমৃত মানুষগুলিকে নৌকা করে ফেলে দেওয়া হলো মাঝ নদীতে। জ্যোতিবসুর স্নেহধন্য সেদিনের তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সদর্পে ঘোষণা করলেন, মরিচঝাঁপি সম্পূর্ণ উদ্বাস্তুশূন্য।

মরিচঝাপির মানুষেরা সেদিন কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের থেকে বেঁচে থাকার কোনো সাহায্য চায়নি। তারা নিজেদের চেষ্টায় আর অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজেদের বাঁচার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছিল। তবুও বাঙ্গালি হয়েও এই পশ্চিমবঙ্গে তাদের ঠাঁই হয়নি। অথচ আজ রোহিঙ্গা মুসলমানরা সেই সুন্দরবন অঞ্চলেই ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক আশ্রয়ে আস্তানা গড়ে তুললেও দণ্ডকের নিম্নবর্গের হিন্দুদের কিন্তু কোনো আশ্রয় সেদিন হয়নি। ■

চিঠিপত্র

স্বামীজীর জন্মদিনে অনেক কথা অনালোচিত থেকে গেল

গত ১২ জানুয়ারি সারাদেশে মহাসমারোহে স্বামী বিবেকানন্দর জন্মোৎসব পালিত হলো। বহুবার উচ্চারিত হলো তাঁর সেই অমোঘ বাণী, ‘‘হে ভারত এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা--- এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? ইত্যাদি। কিন্তু অতি আশ্চর্যের, ইসলাম সম্পর্কে তাঁর কী অভিমত তা কেউ প্রকাশ করলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন, ‘‘এখন লক্ষণীয় যে, মুসলমানরা এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত এবং সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাহাদের মূলমন্ত্র : আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র রসুল। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ হত্যা করিতে হইবে; যে কোনো পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোনো গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারিত হইয়াছে সেগুলি দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া যে রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে, ইহাই মুসলমান ধর্ম।’’

অতি আশ্চর্যের বিষয়, কোথাও এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র আলোচনা হতে শোনা গেল না।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর-৭১২১৩৬।

সেকুলাররা এমন মূর্খ কেন?

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন নিয়ে সারাদেশ জুড়ে বিজেপি বিরোধীরা নোংরা আন্দোলন আরম্ভ করেছে। গণতান্ত্রিক দেশে আন্দোলন হবে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু যেটা বিপজ্জনক তা হলো— আন্দোলনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ মিশিয়ে দেওয়া। এখন যেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হলো বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে পেরে না উঠে মুসলমান তোষণকারী সব বিরোধী রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক তাস নিয়ে কে কত ভালো চাল দিতে পারে তাতে মেতে উঠেছে সিএএ, এনপিআর, এনআরসি-কে অজুহাত করে। নাগরিকত্বের ফলে নাকি এদেশের মুসলমানদের নাগরিকত্ব নিয়ে টানাটানি হবে এরকম একটা ভ্রান্ত অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এইসব মুসলমান তোষণকারী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক সুদৃঢ় করার জন্য। এইসব রাজনৈতিক দলগুলি কট্টরপন্থী মুসলমান বাহিনী এবং তাদের লেজুর অতি প্রগতিশীল ভণ্ড সেকুলার বাহিনী নিয়ে সারাদেশ জুড়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় দেশের সম্পত্তি নষ্ট করছে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার পরিবেশ নষ্ট করছে।

লক্ষ্য করার এবং সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো— আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, জামিয়া মিলিয়া চত্বরে এবং আরও কয়েকটি জায়গায় স্লোগান উঠছে—

‘তেরা মেরা রিস্তা ক্যায়া
লা ইলাহা ইলাল্লাহা’

এবং বুঝে না বুঝে আমাদের অতি প্রগতিশীল ভণ্ড সেকুলার বামপন্থী, কংগ্রেসপন্থী, হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরাও মহা উৎসাহে মহা উল্লাসে তাতে গলা মিলাচ্ছে। এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিগত সিলেবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কারণে এদের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে এই ধারণাটুকু নেই যে প্রগতিশীল সেকুলার হওয়ার মানসে কী ভয়ানক সাম্প্রদায়িক স্লোগানে তারা গলা মেলাচ্ছে। ‘লা ইলাহা ইলাল্লাহা’র মানে হচ্ছে জগতে আল্লা ছাড়া আর কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। এই দর্শনে যারা বিশ্বাস করে তারাই হলো মুসলমান আর এই দর্শনে যারা বিশ্বাস করে না তারা হলো কাফের— মুসলমানদের ঘৃণার বস্তু। এই স্লোগানটি মুসলমান উগ্রপন্থী জিহাদিরা আরবি ভাষায় কালোপতাকায় লিখে তা মহাবিক্রমে নাড়তে থাকে— তা আমরা কাশ্মীরে দেখেছি, সিরিয়াতে দেখেছি, ভারতেও কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে। তা হলে কী দাঁড়ালো? তোমার আমার রিস্তা বা সম্পর্ক কেমন? সেই রকম যে আমরা মেনে নিচ্ছি— আল্লা ছাড়া জগতে আর কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ আমরা মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী, আর কোনো ধর্মের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না। মহামূর্খ না হলে হিন্দুর ঘরের প্রগতিশীল সেকুলারবাদী ছেলে-মেয়েরা এরকম আত্মঘাতী স্লোগানে গলা মেলায়? চিন্তা নেই, ইসলামের রাজত্ব হলে হিন্দুদের মুসলমান বানাবার জন্য গলার সামনে ছুরি ধরে ‘কলমা’ হিসেবে মৌলবীরা পড়িয়ে নেবে— ‘লা ইলাহা ইলাল্লাহা’। যেমন পাকিস্তানে হচ্ছে, বাংলাদেশে হচ্ছে, ইংরেজ আসার আগে এই ভারতের বুকে ৮০০ বছর ধরে মুসলমান নবাব বাদশাহের রাজত্বে হয়েছে। হে প্রগতিশীল সেকুলার মহামূর্খরা! তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুসলমান বানাবার জন্য জোরে জোরে গাও—

‘তেরা মেরা রিস্তা ক্যায়া
লা ইলাহা ইলাল্লাহা’

—**প্রণব দত্ত মজুমদার,**
কলকাতা-৪৮।

ফসলের রোগ নির্ণয়ে নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন

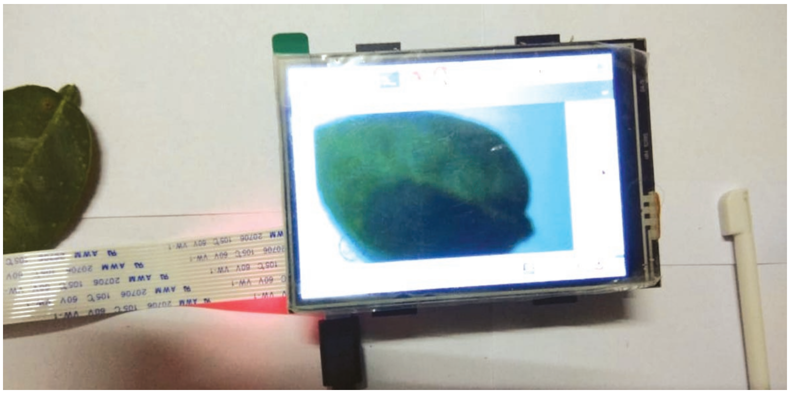

তানিয়া বেরা

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের ৬২ শতাংশ জমিতে কৃষিকাজ হয়, যার বেশিরভাগ নির্ভর করে মৌসুমি বায়ুর উপরে। ২০১০ সালের সমীক্ষা বলছে, ভারতের মাত্র ৩৫ শতাংশ কৃষিজমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। ২০১১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৬৬.৫ শতাংশ কৃষিকাজের উপর জীবনধারণ করে। কিন্তু শিক্ষার অভাবে চাষিভাইদের বিব্রত হতে হয় গাছের রোগ নির্ণয় ও সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে। সেই কথা মাথায় রেখে আমরা একটি ছোটো উদ্যোগ নিয়েছি— একটি যন্ত্র (device) বানাতে যা কৃষকদের সহায়ক হবে। আমরা এর নাম দিয়েছি photochlorometer। এই যন্ত্রটি চালনা করতে প্রয়োজন একটি মোবাইল ফোন (Android) ও ইন্টারনেট। ভারত সরকারের উদ্যোগে ইন্টারনেট আজকাল সবার বাড়িতে।

আমাদের রাজ্যের প্রধান ফসল ধান। সেই ধান চাষ করতে প্রচুর পরিমাণে জল প্রয়োজন পড়ে। ধানগাছের গোড়ায় জল জমা রাখতে হয়, এবার তার সঙ্গে যদি অতিরিক্ত সার বা ইউরিয়া প্রয়োগ করা হয় তাহলে তৈরি হয় মিথেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মতো গ্রিন হাউস গ্যাস। তাই সার দিতে হবে মাপ অনুযায়ী এবং জৈব।

কৃষককের জমির রোগগ্রস্ত গাছের পাতা বা হলদে পাতার ছবি তুলে মোবাইল অ্যাপে আপলোড করতে হবে। তারপর সমস্ত তথ্য চলে আসবে মোবাইল স্ক্রিনে— কী রোগ হয়েছে বা কোন পুষ্টির ঘাটতি হয়েছে এবং তার কী সমাধান ও পরিমাণ সহ। এতে অতিরিক্ত সার প্রয়োগ বন্ধ হবে এবং গাছের রোগ নিরাময়ও হবে। এই যন্ত্রটি ধান ছাড়াও গম, ভুট্টা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। এই যন্ত্র ফসলের পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ ও তার স্বাস্থ্যের কথা জানাবে। ক্লোরোফিল মাপার জন্য দেশে-বিদেশে অনেকরকম যন্ত্র পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে এসপিএডি-মিটার বেশ জনপ্রিয়।

আমাদের দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও এই ডিভাইস বেশ প্রচলিত। কিন্তু এটি ব্যয়বহুল এবং কৃষকদের ব্যবহারযোগ্য নয়। একজন কৃষকের পক্ষে এসপিএডি মিটার কেনা প্রায় অসম্ভব। সেই ভিত্তিতেই আমাদের এই যন্ত্রের কথা চিন্তা করা। তাছাড়া এসপিএডি মিটার গাছের রোগ নির্ণয় করতে পারে না। এই যন্ত্র বর্ণালি বিশ্লেষণ মাধ্যমে ক্লোরোফিলের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে। সাদা আলো সাতটি ভিন্ন রঙের ও ভিন্ন তরঙ্গের আলোকরশ্মির মিশ্রণে তৈরি হয়। সেই সাতটি রং আমরা দেখি রামধনুর মধ্যে। যে কোনো বস্তু এই দৃশ্যমান বর্ণালির বিভিন্ন আলোকরশ্মিকে ভিন্ন মাত্রায় প্রতিফলন করে। সাধারণ দৃষ্টিতে এটি ধরে পড়ে না। কিন্তু বিশেষ আলোকরশ্মি এবং স্পর্শকাতর ক্যামেরা ব্যবহার করলে বিকিরণ মাত্রার সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি নির্ণয় করা সম্ভব। এর মাধ্যমে আমরা একটি বস্তুর রাসায়নিক উপাদান এবং তাদের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারি। এই পদ্ধতিতে ছবি বিশ্লেষণ করে আমরা একটি পাতার সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে পারবো।

আমাদের ধারণা এই যন্ত্র চাষিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তা আমরা জানতে পেরেছি কী চাষিদের সঙ্গে কথা বলে বা আলোচনা করে। আমাদের পরের পদক্ষেপ হবে সরকারি উদ্যোগে এই যন্ত্রকে সাধারণ চাষিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

আমাদের এই প্রোজেক্টটিতে সাহায্য করেছে Indian Institute of Technology Kharagpur, Technical University Munich এবং IEEE (একটি বিশ্বব্যাপী সংস্থা সারা শহর উন্নয়নের স্বার্থে প্রোজেক্ট ফান্ডিং দিয়ে থাকে)। সর্বোপরি উৎসাহ পেয়েছি ভারতের সেই কৃষকদের থেকে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলিয়ে আমাদের প্রতিদিনের অন্ন জোগান দেন।

(তানিয়া বেরা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানির এমএসসি এবং শুভময় মণ্ডল জার্মানির মিউনিখ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির গবেষক)

শিশুর বদলে যাওয়ার উৎসবিন্দু জানতে হবে মা-বাবাকেই

পায়েল ঘোষ

আমাদের সন্তানদের শৈশব ও সারল্য কি কেড়ে নিচ্ছি আমরাই? কিছুদিন আগে টেলিভিশনে একটি রিয়ালিটি শো দেখে একটু থমকে গিয়েছিলাম। মনে মনে দুশ্চিন্তাও হচ্ছিল বেশ কিছুটা। বছর পাঁচেকের মেয়েটি একটি বাণিজ্যিক হিন্দি ছবির গানের সঙ্গে নাচ করছে। প্রকৃত নাচটিতে যে ধরনের যৌন আবেদন নায়িকার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, হুবহু সেই ভঙ্গিটি নকল করার কী সাংঘাতিক প্রয়াস ছোট্টো শিশুটির মধ্যে। এর ফলে আদতে কী ধরনের মানসিকতা নিয়ে বড়ো হবে ওই শিশুটি? যে বয়সে ওর নির্মল মনে খেলাধুলা করার কথা, মায়ের কাছ ঘেঁসে বড়ো বড়ো চোখ করে গল্প শোনার কথা, সেখানে ওর মধ্যে জন্ম নিচ্ছে বড়োদের মতো হাবভাব ও মানসিকতা। আপাতভাবে শুনতে খারাপ লাগলেও আমরা অভিভাবকরা অনেকটাই দায়ী এসবের জন্য। গত দশ বছরে জুনিয়র স্কুলের বাচ্চাদের প্রাত্যহিক রুটিনে বেশ অনেকটা পরিমাণ রদবদল হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে বড়োদের খুব একটা পার্থক্য নেই। স্কুল থেকে ফিরে অধিকাংশ বাচ্চাই টিভি বা মোবাইল দেখতে দেখতে খাওয়া দাওয়ার পাট সারে। তারপর একটা লম্বা ঘুম চলে প্রায় সন্ধ্যে গড়িয়ে যাওয়া অবধি। ঘুম থেকে উঠে আবার টিভি দেখা বা পড়তে বসা। শৈবের যে বিরাট একটা অংশ খেলাধুলো, বন্ধুদের সঙ্গে খুনসুটি আর মজা— তা যেন কোনো এক অদৃশ্য মন্ত্রবলে ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গেছে।

বর্তমানে অধিকাংশ বাচ্চাই বড়ো হচ্ছে অণু পরিবারে। বাড়িতে সদস্য বলতে তারা এখন বোঝে মা আর বাবাকে। তাদের দুজনকে আঁকড়ে ধরেই ছোটোদের শৈশব অতিবাহিত হয়। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায়, মা-বাবার মধ্যে মতান্তর তীব্র হয়ে ওঠে, তারা বাক্যক্ষেপণের প্রতি সংযম হারিয়ে ফেলেন, একে অপরকে বিধ্বস্ত করতে থাকেন পর্যায়ক্রমে। বাড়িতে তাঁদের কোনো অভিভাবক না থাকার জন্য আত্মসংযমী হতে পারেন না অধিকাংশ সময়। তার সম্পূর্ণ প্রভাব পড়ে বাড়ির ছোট্টো সদস্যটির ওপর। পরিবার, সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে অকারণ জটিলতা তৈরি হয় তাদের মনে। তার ফলস্বরূপ কথায় কথায় রাগ ও বিরক্তির উদ্রেক হয় ওদের মনে। আমরা বহ্যিক ভাবে বিশ্লেষণ করে ভাবি ওরা জেদি আর একগুঁয়ে। কিন্তু অধিকাংশ সময় সেই ব্যবহারের উৎসবিন্দুটি জানার চেষ্টা করি না। আমরা বুঝতেও পারি না ওরা শৈশবের সারল্য সরিয়ে রেখে মনের সঙ্গে আপোশ করে নিজেদের প্রশমিত রাখার চেষ্টা করে চলে প্রাণপণ। বর্তমানে যেভাবে আমাদের জীবন এগোচ্ছে তাতে বিনোদনের সমাহার ক্রমশ বাড়ছে। টিভি খুললেই একের পর এক চ্যানেল, সঙ্গে মোবাইল ফোন তো আছেই। মোবাইল ফোন তো কথা বলার চাইতে বিনোদনের সম্ভার হিসেবেই বেশি মাত্রায় পরিচিত এখন। এই বিশাল আনন্দবলয় থেকে ছোট্টো সন্তানকে দূরে রাখা সত্যিই বেশ কঠিন কাজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকরা ব্যর্থ হচ্ছেন এই কাজটি করতে। তার ফল হয়ে উঠছে মারাত্মক। কিছুদিন আগে বছর ছয়েকের একটি ছোট্টো মেয়ে ক্লিনিকে আসে। মা-বাবার বক্তব্য, রাত্রিবেলা সে অস্থির হয়ে ওঠে, স্কুলের কাজকর্মে মন নেই, সবসময় একটা বিচলিত ভাব। বাচ্চাটির সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলার পর আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মায়ের ফোনে সে দেখেছে বিবস্ত্র নর-নারীর ভিডিয়ো। তারপর তার মাথায় শুধু সেসবই ঘোরে, কেমন যেন ভয় ভয় করে তার সবসময়। অর্থাৎ যে বয়সে ছোটো বাচ্চাটির মনের সুখে খেলে বেরানোর কথা, তার পরিবর্তে ছোটো মাথায় তার চেপে বসেছে যৌনসংসর্গের ছবি। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদেরই হাত ধরে বাচ্চারা শৈশবের রাস্তা ভুলে হাঁটছে অন্যদিকে।

আরও একটা বিষয়কে উল্লেখ না করলেই নয়। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত স্মার্টফোন। অভিভাবকদের হোমওয়ার্ক আদানপ্রদান থেকে শুরু করে স্কুলের রোজনামচা সবই বিভিন্ন ধরনের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এসব গ্রুপের মধ্যে আলোচিত হচ্ছে স্কুল সম্পর্কে নেতিবাচক কথা। অনেক সময় বাচ্চারাও সেসব বিষয়ে অবগত হচ্ছে। ফলে তাদের সরল মনে জেগে উঠছে বিভিন্ন ধরনের স্কুল-বিরোধী মন্তব্যের প্রভাব। এভাবেই ওদের মন জটিল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

কিন্তু এভাবেই কি চলবে ওদের জীবন? আস্তে আস্তে ওদের মন থেকে কি এভাবেই বিলীন হয়ে যাবে শৈশবের সারল্য ও আনন্দের রেশ? তাই প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে নিজেদের ব্যবহার ও বাক্য প্রয়োগের বিষয়ে। ওদের মনে জটিল সম্পর্কের তাৎপর্য বিষয়ক চাপ না থাকে তার ভারও আমাদেরকেই নিতে হবে। খেলাধুলা, গানবাজনা, বন্ধু-বান্ধব দিয়ে ভরে রাখতে হবে ওদের দিনসূচি। গল্পের বই পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে হবে আবার। নিজেদের মতো করে ভাবার আর খেলার সুযোগ দিলে ওদের মন ভরে উঠবে আনন্দে। ওদের হাসির ছটায় আলোকিত হব আমরাও।

(লেখিকা পেরেন্টাল কনসালটেন্ট)

গনোরিয়া ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

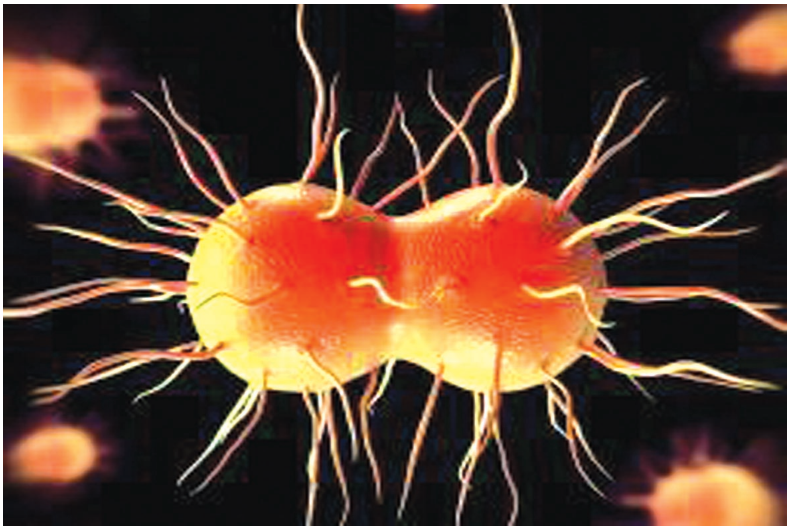

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

গনোরিয়া এমন একটি রোগ যেটি মহিলা ও পুরুষ দুজনেই হতে পারে। আসলে এটি একটি সেক্স্যুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ বা এসটিডি। মূলত দেখা গেছে মহিলাদের তুলনায় পুরুষরাই এই রোগে বেশি করে আক্রান্ত হন। কোনও একজনের শরীরে যদি এই রোগ থাকে, তাহলে অন্য পার্টনারের শরীরেও তা ছড়াতে পারে। বিশেষ করে চিকিৎসা না করিয়ে দিনের পর দিন ফেলে রাখলে এই রোগটি ক্রমশ বাড়ে। এই রোগের কারণ হলো নাইসেরিয়া গানোরিয়া নামক একটি ব্যাকটেরিয়া। তবে শরীরে ব্যাকটেরিয়া ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে উপসর্গগুলি প্রকাশ পায় না। ইনকিউবিশন পিরিয়ড মোটামুটি ২-১০ দিনে মানে তারপরেই শরীরে রোগের লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে। আসলে গনোরিয়ার জীবাণু নাইসেরিয়া শরীরের বাইরে বেশিদিন থাকতে পারে না। এরা বেঁচে থাকে কেবল নিবিড় যৌন মিলনের মাধ্যমে এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয়। সহবাস ছাড়াও গনোরিয়ার জীবাণুযুক্ত কাপড়, তোয়ালে বা অন্তর্বাস ব্যবহারেও এটি ত্বকের সূক্ষ্ম ছিদ্র শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

উপসর্গ ও রিস্ক ফ্যাক্টর :

সুতরাং বোঝা গেল রোগটি কেন হয়। এবার জেনে নিন এর উপসর্গ সম্পর্কে, যা দেখা দিলেই সেটাকে কোনওমতেই অবহেলা করবেন না। পুরুষ ও মহিলা বিশেষে এই রোগের উপসর্গ ভিন্ন। গনোরিয়া হলে পুরুষদের যৌনাঙ্গ দিয়ে পুঁজ বের হয়, সঙ্গে ইউরিনে দুর্গন্ধ জ্বালাপোড়ার অনুভূতি। যে কোনও ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগেই দুর্গন্ধ হওয়াটা স্বাভাবিক। রোগটির প্রকোপ যদি খুব বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে ইউরিনের সঙ্গে রক্তও আসতে পারে। এটা পুরুষাঙ্গ, সার্ভিক্স বা জরায়ুর ছিদ্রপথ, রেক্টাম, গলা ও চোখকে আক্রান্ত করতে পারে। এমনকী সংক্রমণ যদি খুব বেশি হয় বা বার বার তাহলে চিরকালীন বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কমন উপসর্গ হলো অতিরিক্ত সাদা স্রাব ও তাতে দুর্গন্ধ। এই সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে এলে তার প্যাথেলেজিক্যাল টেস্ট করানো হয়। সঙ্গে ইউরিনে জ্বালা জ্বালা ভাব, বারে বারে ইউরিন হওয়া, তলপেটে ব্যথা বা ফুলে যাওয়া এই রোগের উপসর্গ। মহিলাদের গনোরিয়া বেড়ে গেলে ইউরিনের সঙ্গে রক্ত পর্যন্ত বের হতে পারে।

গর্ভাবস্থা, গনোরিয়া এবং শিশুর ক্ষতি :

গনোরিয়ার জীবাণু গর্ভবতী মহিলাদের জননতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ডিম্বাণুবাহিত নালিতে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এই জন্যই মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব সমস্যা হয়। গর্ভবস্থায় গনোরিয়া খুবই মারাত্মক, ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার গনোরিয়া আছে জানা নেই, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে গর্ভধারণ হয়ে গেল তাতে জরায়ুর বাইরে গর্ভধারণ হয়, একে বলা হয় এক্টোপিক প্রেগনেন্সি। এর ফলে ভ্রূণ-সহ অনেক সময়ে ফ্যালোপিয়ান টিউবও বাদ দিতে হয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের যদি গনোরিয়া হয়, তাহলে সেখান থেকে বাচ্চারও হতে পারে যার দরুন প্রসবের পরে শিশুর সবার আগে ক্ষতি হয় চোখে। চোখ দিয়ে প্রথমে জল ও পরে ঘন পুঁজ পড়তে পারে। যদি সঠিক সময়ে ইনফ্লামেশনের চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে বাচ্চা অন্ধ পর্যন্ত হতে পারে।

চিকিৎসা করতে হবে সাবধানে :

গনোরিয়া রোগটি ছোঁয়াচে। ফলে এর চিকিৎসকের পরামর্শমতে অ্যান্টিবায়োটিক ওরাল মেডিসিন ও ইঞ্জেকশন নেওয়ার পাশাপাশি আক্রান্ত স্থানে মলম লাগাতে হবে। পরিষ্কার ভেজা তুলো (অবশ্যই স্টেরিলাইজড কটন) দিয়ে আক্রান্ত স্থানের পুঁজ পরিষ্কার করতে হবে। খুব সাবধানতার সঙ্গে হাতে গ্লাভস পরে না করলে নার্সরাও এই রোগের কবলে পড়তে পারেন।

সতর্কতা :

একাধিক যৌনসঙ্গী রাখবেন না, এর থেকে রোগ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। যৌনমিলনের পরে কোনওরকম অস্বস্তি হলে দেরি না করে চিকিৎসক দেখান।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : মায়াজম ও কারণ ও লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। ■

বাঙ্গালির উঠোনে হিরোসিমার ট্রেলর

সন্দীপ চক্রবর্তী

যেদিন বাজি নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে নৈহাটিতে বিস্ফোরণ ঘটল, সেদিন সন্ধ্যেবেলার ঘটনা। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে এক লেখক বন্ধু মোবাইলে বিস্ফোরণের ছবি দেখিয়ে বললেন, 'সর্বনাশ! এ তো পুরো হিসোসিমা।' বন্ধুর বিস্ময় অকারণ বলা যাবে না। বিস্ফোরণের পর বিশাল আগুনের গোলা এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে হিরোসিমার কথাই প্রথমে মনে আসে। সেই সঙ্গে একটা প্রশ্নও উঠে আসে। পশ্চিমবঙ্গের আজকের রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই বিস্ফোরণ কি অপ্রত্যাশিত?

বস্তুত দেবকের বাজি তৈরির কারখানাটি কয়েক দশক ধরে চলছে। এর সূত্রপাত বাম আমলে। তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বাজির কারখানাগুলিকে বোমা তৈরির কারখানায় পরিণত করা চলছে। তৃণমূল আমলে বোমা শিল্পে আরও কয়েক কদম এগিয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ। দেবকের বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই কারবারে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত একটি সমাজবিরোধীদের চক্র। ভিনরাজ্য থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে আসা থেকে এখানে তৈরি সামগ্রী অন্যত্র পাঠানো, সব কিছুর নিয়ন্ত্রক এই চক্রটি। এমনও কিছু কারখানা চলে, যেগুলির মালিকের বাড়ি দেবক গ্রামে নয়। জেলার অন্যত্র থেকে বা ভিন জেলার বাসিন্দা হয়েও দেবক গ্রামে কারখানা চালায়। কারখানায় শুধু শ্রমিকেরা কাজ করে। দেখভালের দায়িত্বে থাকে ওই সমাজবিরোধী চক্রটি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই চক্রটিকে ভাঙতে পারেনি পুলিশ। এই চক্রে শাসকদলের নেতাদের মদত রয়েছে। পার্টি তহবিলে উৎসবগুলিতে মোটা অঙ্কের চাঁদা দেয় বাজি কারখানার মালিকেরা। যার ফলে পার্টির নেতারা সব জেনেও চুপ করে বসে থাকে।

একইরকম কথা শোনা গেছে ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংহের মুখেও। দেবকের বাজি কারখানায় যেদিন বিস্ফোরণ ঘটল সেদিন অর্জুন সিংহ বলেন, কোনও বাজির বিস্ফোরক থেকে এতবড়ো ঘটনা ঘটতে পারে না। এখানে ১০০টিরও বেশি অবৈধ বাজি কারখানার আড়ালে শক্তিশালী বোমা তৈরি করা হয়। সেই বোমাই গোটা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে সরবরাহ করা হয়। সেরকমই তীব্র শক্তিশালী কোনও বিস্ফোরক এখানে মজুত ছিল।' তিনি দাবি করেন, 'পুলিশ গোটা ঘটনা ধামাচাপা দিতে চাইছে। ওরা দিনের পর দিন এই অবৈধ কারবার চালিয়ে আসছিল। আমি এই ঘটনা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জানিয়েছি। আমি চাই এনআইএ এই ঘটনার তদন্ত করুক। এটা দ্বিতীয় খাগড়াগড় বলে মনে হচ্ছে আমার।'

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একনায়ক-তান্ত্রিক প্রভাব যত বাড়ছে, ততই বেলাগাম হয়ে উঠছে এইসব অবৈধ বাজির কারখানা। এখানে বছরে মাত্র তিন মাস বাজি তৈরি হয়, বাকি ন' মাস বোমা। বলা বাহুল্য, প্রধানত বিরোধী কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখতে এই বোমা ব্যবহার করেন শাসকদলের নেতাকর্মীরাই। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, খুনোখুনির ওই রাজনীতির শিকার মাঝে মাঝে তৃণমূল কর্মীরাও হন। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর কর্মী অন্য গোষ্ঠীর ছোঁড়া বোমায় খুন হন। এরকমই এক ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। গত বছরের জুন মাসের ঘটনা। তৃণমূলেরই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে নিহত হন মিন্টু মণ্ডল, নান্টু মোল্লা এবং ছবি শেখ। একটি নদীবন্দরের দখল নিয়ে লড়াই চলছিল দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। একই রকম ঘটনার সন্ধান আমরা পাচ্ছি উত্তর চব্বিশ পরগনার কাঁকিনাড়ায়। লোকসভা নির্বাচনে জেতার পর সেখানে বিজয় মিছিল বের করেছিল বিজেপি। তৃণমূলের গুন্ডারা মিছিল লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। বিজেপির দু'জন কর্মী মারা যান। গত বছর জামাই ষষ্ঠীর রাতে সন্দেশখালিতে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা করেছিল তৃণমূলের গুন্ডারা। সেখানেও বোমা এবং তিনজন বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়।

সুতরাং দেবকের ঘটনা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের কোনও রাজনৈতিক কর্মী, বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী যে কোনওদিন বোমার আঘাত পেতে পারেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গের শাসক এখন যেন তেন প্রকারে বিজেপিকে থামাতে চায়। তার জন্য বাজির কারখানায় বোমা বানাতে হলে বানাতে হবে। আরও দু-একটা খাগড়াগড় হলে হবে। এমনকী বারুদের স্তূপের ওপর আসীন পশ্চিমবঙ্গ যদি একদিন ধোঁয়ার কুণ্ডলী হয়ে উড়ে যায়, তাতেও কুছ পরোয়া নেহী! আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আছেন, তিনি প্রেসকে বলে দেবেন, ওসব ছোটো ঘটনা। ভুল করে হয়ে গিয়েছে। ■

বাম আমলের বারুদের স্তূপ তৃণমূল আমলে প্রাণঘাতী বিস্ফোরক

সুজিত রায়

যাদের চোখের সামনে ঘটেছিল বিস্ফোরণটা, তাঁদের বেবাক দৃষ্টি যেন তিরের মতো বিঁধছিল। তাদের একটাই প্রশ্ন--- হিরোসিমা- নাগাসাকি কি ফিরে এল? তীব্র আগ্নেয় গোলক তুষারশুভ্র ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে যখন ছুটছিল নীল আকাশকে লক্ষ্য করে, তখন টিভির পর্দায় কোটি কোটি দর্শকের বিস্ফারিত নেত্র একটাই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছিল— কত হাজার কেজি বিস্ফোরককে আগুন লাগালে তবে হতে পারে এমন বিস্ফোরণ। এগুলো কি সত্যিই বারুদ নাকি আরডিএক্স-এর মতো প্রাণঘাতী বিস্ফোরক যা নাশকতাপন্থী দাউদ ইব্রাহিম, তালিবান আর ধ্বংসের উন্মত্ততায় মেতে ওঠা আই এস বাহিনীর সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র হিসেবে স্বীকৃত?

বিস্ফোরণ গঙ্গার ওপারে নৈহাটিতে। মাঝখানে হাত পা ছড়িয়ে শীতের দুপুরে পড়ে থাকা বিস্তীর্ণ গেরুয়া গঙ্গা। কিন্তু কেঁপে উঠল এপারের চুঁচুড়াও। ভেঙে পড়ল, দেওয়ালে ফাটল ধরল কমবেশি ৬০০ বাড়ি। এমনকী স্থানীয় পুরভবন-সহ চারটি সরকারি বাড়িও। কোনো বাড়ির শক্তপোক্ত দরজা ভেঙে পড়েছে সপাটে। কোনো বাড়ির জানালার কাঁচ সব ভেঙে পড়েছে ঝনঝন করে। খসে পড়েছে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি। পলেস্তারাহীন পলকা দেওয়ালও। নৈহাটির গঙ্গাপাড়ের বাড়িগুলির মতোই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এপারের প্রতাপপুর, জোড়াঘাট, ময়ূরপঙ্খী ঘাট চকবাজার বাবুগঞ্জ-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা।

গত ৯ জানুয়ারি এই বিস্ফোরণ ঘটার এক সপ্তাহ আগেই নৈহাটির দেবক গ্রামে বাজি কারখানার ভয়াবহ বিস্ফোরণ স্পষ্ট করে দিয়েছিল বাজি কারখানায় শুধু বাজিই হতো না। তৈরি হতো ভয়াবহ বিস্ফোরকশক্তি-সহ বোমাও। ওই কারখানারই অক্ষত বারুদের স্তূপ এনে ফেলা হয়েছিল নৈহাটির গঙ্গাতীরে ছাইঘাটে পুলিশি তত্ত্বাবধানে। তাতেই ধরানো হয়েছিল আগুন পুলিশি নিয়ন্ত্রণেই। পুলিশও কি ভাবতে পেরেছিল— ওগুলো শুধুমাত্র বাজি তৈরির বারুদ ছিল না?

একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। এরাজ্যে তখন বাম-জমানা। মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। অতি সংগোপনে সীমিত কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সাংবাদিককে তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমরা, পশ্চিমবঙ্গবাসীরা বারুদের স্তূপের ওপর বসে আছি। যেদিন একটা স্ফুলিঙ্গের স্পর্শ পাবে, সেদিনই কেঁপে উঠবে গোটা রাজ্য। বলেছিলেন, এ রাজ্যের প্রতিটি মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরির কারখানা। প্রতিবছর এইসব মাদ্রাসা থেকে প্রশিক্ষিত হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের তালিকায় নাম লেখাচ্ছে হাজার হাজার জেহাদি মুসলমান যুবক।

বিস্ফোরণে নিহত শ্রমিক।

সেদিনের বারুদ আজ তৃণমূলি জমানায় ভয়াবহ বিস্ফোরককে পরিণত হয়েছে। তার প্রমাণ কয়েক বছর আগে বর্ধমানের খাগড়াঘাটের ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা। বুদ্ধদেববাবু কিছু করতে পারেননি। কিন্তু সত্যিটা স্বীকার করেছিলেন। এখনকার সরকার সত্য স্বীকারের ধার ধারে না। নৈহাটির বিস্ফোরণের পরেও এরাজ্যের সততার খোলস খসে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রী একবারও সত্যিটা মেনে নেননি যে, গত ন' বছর ধরে তাঁরই প্রশ্রয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিস্ফোরকের গুদামঘরে পরিণত হয়েছে। একবারও রাজ্য প্রশাসন স্বীকার করেনি, দেবক গ্রামের বাজি তৈরির কারখানা ছিল এ রাজ্যের বোমা-শিল্পের আঁতুড়ঘর। বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত নৈহাটির মানুষ যখন সত্যটা জানতে পথে নেমেছেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী অনেক দূরের জনসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, বোমা নিস্ক্রিয় করতে গিয়ে ভুলচুক করে ফেলেছে পুলিশ। আমরা সব ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেব। আহা! কী মধুর বাণী। সেই কামদুনি বা সুজেটের ধর্ষণের কাহিনির পরের প্রতিক্রিয়া মতো— 'ওসব ছোটোখাটো ঘটনা। দুষ্টু ছেলেরা করে ফেলেছে। যেন মুখ্যমন্ত্রী চোখে দেখেন না কিছু। কানে শোনেন না কিছু। তদন্তের কথা নৈব নৈব চ। শুধু ক্ষতিপূরণ। রাজ্যটাকে— গোটা রাজ্যবাসীকে তিনি ভিখারির চেয়ে বেশি কিছু ভাবতেই পারেন না। তাই জনগণের করের টাকা বিলোন দু'হাতে ভোট কিনতে আর ক্ষমতা ধরে রাখতে। এর বেশি আর কিছু তিনি ভাবেনেই না।

খুব সাম্প্রতিক হিসেব বলতে পারব না। কারণ, সে সব হিসেবে মিশে আছে প্রচুর জল যেমন জল মিশে আছে মিড ডে মিলের হিসেবে, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রকল্পের টাকায়, স্বাস্থ্যশ্রী, যুবশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, সংখ্যালঘু স্কলারশিপ প্রকল্পে।

কিন্তু প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা যাক ২০১৪ সালের একটি হিসাব। ওই বছর এরাজ্যে ধরা পড়েছিল ৪৯৩০টি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ২৭০২০টি গ্রেনেড, ৮৪০টি রকেট লঞ্চার, ৩০০টি রকেট, ২০০০ গ্রেনেড লঞ্চিং টিউব, ৬৩৯২টি বুলেট ম্যাগাজিন এবং ১১৪০৫২০টি বুলেট। সবই বেআইনি। আর প্রতিটি ঘটনায় ধৃত অভিযুক্তরা হলেন সংখ্যালঘু মুলমান। ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি জানাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে ৪৫০০টি মাদ্রাসায় চলছে জেহাদি প্রশিক্ষণ। যার সিংহভাগ মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ার সীমান্তে এবং প্রতিটি মাদ্রাসার পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী।

দেবকে বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত বাড়ির আগুন নেভাচ্ছেন দমকল কর্মীরা।

না, মুখ্যমন্ত্রী এসব কিছুই জানেন না। জানেন না এরাজ্য থেকে নাবালিকা মুসলমান মেয়েগুলো কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে এবং নারী পাচারের শীর্ষস্থানে এবছরও মুখ আলো করে বসে আছে পশ্চিমবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী দেখেও দেখেও দেখেন না, এই সব নাবালিকাকে পাঠানো হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে, এমনকী গৃহবধূদেরও।

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৭০ থেকে ২০১৬— গোটা ভারতবর্ষে এই ৪৬ বছরে ৯৯৪২টি সন্ত্রাসবাদী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৮৮৪২ জন। গুরুতর জখম হয়েছেন, ২৮৮১৪ জন। প্রতিটি ঘটনার পিছনেই রয়েছে মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা। অথচ পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন গজাচ্ছে নতুন নতুন মসজিদ সরকারি মদতে। জেলায় জেলায় গড়ে উঠছে হজ হাউস। গড়ে উঠেছে ৪০০-র বেশি মাদ্রাসা হস্টেল। চল্লিশ হাজার ইমামকে মাসে ২৫০০ করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। কারণ, বিবি সাহেবানের মূল লক্ষ্য— পশ্চিমবঙ্গটাকে মুসলমান প্রধান রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা। সেটা করতে পারলে শুধু তাঁর গদি নয়— নিশ্চিত হয়ে যাবে তাঁর ভাইপো-সহ আগামী ১৪ পুরুষের তখত দখল।

প্রশ্ন হলো, কোন পথে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ? একজন শাসকের ব্যক্তিগত স্বার্থ যখন গোটা দেশকে, দেশের মানুষের স্বার্থকে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়, তার পরিণাম কী ভয়াবহ হতে পারে, কদিন আগে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় জেহাদি মুসলমানদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে তা পরিষ্কার। একদিনে শুধু দক্ষিণ-পূর্ব রেলেই তারা ১৬ কোটি টাকার ক্ষতিসাধন করেছে। পরবর্তী ক'দিন মিলিয়ে গোটা দেশে এই হার্মাদবাহিনী শুধুমাত্র রেলের ক্ষতিসাধন করেছে ৭০ কোটি টাকার। মাত্র ২/৩ দিনেই বোঝা গেছে, এ রাজ্যে কাদের মাথায় তুলে ধিনধিন করে নাচছেন মুখ্যমন্ত্রী? কাদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন এ রাজ্যে তাঁর বরাভয়ের আশীর্বাদ? কাদের ভোটের আশায় তিনি রাজ্যের ভূমিপুত্রদের বিরুদ্ধে ছোবল তোলার ইন্ধন জোগাচ্ছেন? কেন তিনি বাধা দিচ্ছেন জাতীয় জনগণনায়? জাতীয় নাগরিকত্ব আইনে? নাগরিক পঞ্জিকরণে?

হিসেব মেলালে দেখা যাবে, এরাজ্যের শাসক এবং তাঁর পরিচালিত শাসকদলের কতিপয় চরম ধান্দাবাজ মন্ত্রী ও কলাকুশলীদের ছত্রছায়ায় গোটা রাজ্য তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের গর্ভে। মুখে যতই উন্নয়নের বাণী ছড়ান, সবটাই যে নাটক, তা আজ মানুষের কাছে স্পষ্ট। মা-মাটি-মানুষের স্লোগান তুলে তিনি রাজ্যের ভূমিপুত্রদের জমিহারা করতে চাইছেন। ভূমিপুত্রদের শিকড়ে আঘাত হানতে চাইছেন। বুঝতে পারছেন না, রাজ্যের শহরে গ্রামে সর্বত্র তিনি নিজের হাতে শত শত ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করছেন। এমন একদিন আসবেই (এবং সম্ভবত সেদিন বিশেষ দূরে নয়) যেদিন ওই হাজার হাজার সংখ্যালঘু ফ্রাঙ্কেনস্টাইন শাসকের গলা টিপে ধরবে। সেদিন তিনি কীভাবে নিজেকে রক্ষা রাখবেন, সে ভাবনা তাঁর ব্যক্তিগত। কিন্তু সমস্যা হলো, ততদিনে দেশের সমূলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আজ যখন গোটা রাজ্য দাঁড়িয়ে আছে তীব্র বিস্ফোরণের মুখে, যখন প্রশাসনিক স্থবিরতায় গোটা রাজ্যের মানুষ ছিন্নমূল হবার সম্ভাবনার মুখে দাঁড়িয়ে, তখন সামগ্রিকভাবে রাজ্যের ভূমিপুত্র তথা হিন্দু জনগণকে রুখে দাঁড়াতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার খোলসে নিজেকে আবৃত রেখে কোনো হিন্দুই এই সংখ্যালঘু তোষণকারী সরকারের গ্রাস থেকে নিজেকে এবং নিজের পরিবার বা সম্পত্তিকে রক্ষা করতে পারবে না। ঠিক তেমনটি পারেননি বাংলাদেশের হিন্দু জনগণ।

আজ বাংলাদেশের হিন্দু জনগণের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বঙ্গসন্তানদের ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার সময় এসে গেছে। মনে রাখবেন, আপনি যখন রুখে দাঁড়াবেন তখন শাসকদল আপনাকে বলবে সাম্প্রদায়িক। শাসকদল আপনার বিরুদ্ধে ঘরশত্রুদের লড়িয়ে দেবে। আপনাকে অপমান করা হবে। হেনস্থা করা হবে। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হবে।

এগুলো শত্রু শিবিরের স্ট্র্যাটেজি। লড়াই দরকার এই স্ট্র্যাটেজির বিরুদ্ধে। একা নয়— সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন। এটা রাজনীতির লড়াই নয়। ভুলে যান, আপনি কংগ্রেস, আপনি বিজেপি, আপনি বামপন্থী কিংবা আপনি তৃণমূল কংগ্রেস। আপনার একটাই পরিচয়, আপনি বঙ্গসন্তান। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিপুত্র। আপনি বিদেশি নন। আপনি অনুপ্রবেশকারী নন। আপনার দেশ ভারতবর্ষ। আপনার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। বঙ্গমাতাকে রাখার দায়িত্ব আপনার, আমার, আমাদের সকলের। ■

বোমা শিল্পেও এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ

রণিতা সরকার

১৯৪৫ সালের জাপানের হিরোসিমা নাগাসাকির পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের মিনি ট্রেলার দেখার সুযোগ পেল মমতা ব্যানার্জির 'সোনার বাংলা'। ব্যান্ডেল নিবাসী হওয়ার দরুন ঘরে বসে কেঁপে উঠলাম কান ফাটানো বিকট শব্দ ও তীব্র কম্পনে। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় মনে হলো আশেপাশে কোনো বোমা ফেটেছে। ঘরে একটু কম্পনও অনুভূত হলো। কিছুক্ষণ পর নিউজ চ্যানেলে খবরটি সম্প্রচারিত হলো।

মালদার কালিয়াচক, বর্ধমানের খাগড়াগড়ের যোগ্য উত্তরসূরী নৈহাটির দেবকগ্রাম। বারুদের আঁতুরঘর আজ শুধু এই স্থানগুলি নয়, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে আজ প্রসিদ্ধ এই কুটিরশিল্প। গত জানুয়ারিতে অগ্নিসংযোগ হয় নৈহাটির দেবকগ্রামের বাজি কারখানায়। ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয় পরে আরও একজনের। আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়ি ভেঙে পড়ে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যারাকপুর কমিশনারেটের পুলিশ তখন থেকেই বাজি তৈরির মশলা বারুদ বাজেয়াপ্ত করে সেগুলিকে ৩/৪ দিন ধরে ধারাবাহিকভাবে নিস্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া চালায়। স্থানীয় মানুষজনের আপত্তি সত্ত্বেও যথাযথ নিয়ম পালন না করেই তারা এই প্রক্রিয়া চালায়। ৯ জানুয়ারি ছিল শেষদিন, ফলে জমে থাকা সমস্ত বারুদ মশলার যথাযথ পরীক্ষা না করেই এবং তাদের তীব্রতা না বুঝেই নৈহাটি পুরসভার ১৪নং ওয়ার্ডের গঙ্গার পাড়ের সংলগ্ন ছাইঘাটে বোম্ব স্কোয়ার্ড নিষ্ক্রিয় করার কাজটি করে, আর তাতেই স্থানীয় অঞ্চল তো বটেই বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে শ্যামনগর থেকে নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই প্রকট রূপ নেয় সাড়ে চার কিলোমিটার গঙ্গার ওপারে শহরের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড কম্পনের জেরে বাবুগঞ্জ ঘাট, জোড়াঘাটসহ এলাকার ঘরবাড়ির কাঁচের জানলা ভেঙে পড়ে, ঘরের পুরু দেওয়ালে ফাটল দেখা যায়, এমনকী হুগলী-চুচুঁড়া পৌরসভার কয়েকটি দপ্তরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছাইঘাটের ৫০ মিটারের অনতিদূরে জুটমিলের শ্রমিকদের আবাসনের প্রায় আটটি বাড়ির অ্যাজবেস্টারের ছাউনি ভেঙে পড়ে। অ্যাজবেস্টর ভেঙে পড়ে এক পাঁচ বছরের শিশু গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ বাজি নয়, বাজির সঙ্গে শক্তিশালী বোমাও ছিল।

ওই বাজি কারখানার মালিক নুর হুসেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও বিধায়কের ঘনিষ্ঠ। সরকারের লোকের পরোক্ষ মদত ছাড়া এই কাজ যে অসম্ভব তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। খাগড়াগার বিস্ফোরণের পর এন আই এ-র তদন্ত সাপেক্ষে বেশ কয়েকটি মাদ্রাসাতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল এবং যার ফলে মাদ্রাসাগুলি থেকে অনেক নথি উদ্ধার হয়েছিল। তাহলে কী বলা যায় এটি শুধুমাত্র ঘটনার পুনরাবৃত্তি? রাজ্য সরকারের পরোক্ষ মদতে রাজ্যজুড়ে এইসব বাজি কারখানার নামে জেহাদিরা শক্তিবৃদ্ধি করছে এবং অবশ্যই স্থান কাল ও পাত্র পরিবর্তনশীল, তবে প্রেক্ষাপট অপরিবর্তনীয়। প্রেক্ষাপটটি এক। চিন্তাশীল বুদ্ধিদীপ্ত বাঙালি একটু চিন্তনশক্তি তীক্ষ্ণ করলেই বাস্তব রূঢ় সত্যিটি উপলব্ধি করতে পারবেন। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিদিনের কম্যান্ডার ও তার স্ত্রী ফতিমা এন আই এ-র কাছে স্বীকার করে তারা সিমুলিয়া ও লালগোলা মাদ্রাসা থেকে মুসলমান যুবকদের জেহাদের ট্রেনিং দিত ও কার্যকলাপ সংগঠিত করত এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যে মুসলমান তরুণ-তরুণীদের উৎসাহিত করত। শেখ রহমাতুল্লাহ নামে আরেক বাংলাদেশী জঙ্গি তদন্তে স্বীকার করে সে মজলিস-ই-সুরার কম্যান্ডার। বিস্ফোরণের বীভৎসতা দেখে অনুমান করাই যাচ্ছে নৈহাটি আর কিছুই না, খাগড়াগড়ের উত্তরসূরী।

একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষ পশ্চিমবঙ্গের বুকে এভাবেই বাজি কারখানা বা বলা যায় কুটিরশিল্পের নামে জেহাদি শক্তিবৃদ্ধি করবে আর সরকার চোখ বন্ধ করে থেকে যাবে—এরপর আর কি বলা যাবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'? সোনার বাংলায় আজ আর সোদা মাটির গন্ধ নেই, আছে বোমা বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধ। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই জেহাদিদের প্রশাসন খিদমতগারি করবে, বাজির আড়ালে অন্য নাশকতামূলক কারবার তারা রমরমিয়ে করে যাবে। একটি বিস্ফোরণ হবে, প্রশাসনের ঘুম ভাঙবে, মানুষজন জোগে উঠবে, দু'চারদিন পর আবার সেই। এই নিয়ম চলছে চলবে। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের দাবি, বাজির মধ্যে মাইন জাতীয় কিছু ছিল। তা না হলে গঙ্গা পেরিয়ে চুঁচুড়ায় বিস্ফোরণের শব্দ যেত না। কিন্তু সরকার, সিআইডি এই তত্ত্ব মানতে নারাজ। স্থানীয় বিধায়ক পার্থ ভৌমিক একদিন আগে একটি বেসরকারি নিউজ চ্যানেলের প্যানেলে গিয়ে একটি অন্য ইস্যুতে সরকারের হয়ে গলা ফাটাচ্ছিলেন, নিজস্ব এলাকায় এই বীভৎসতা নিয়ে তাঁর কোনো বিবৃতি নেই। আর মাননীয়ার সেই ক্ষতিপূরণ সিস্টেম আজও দীর্ঘজীবী! বিষমদ খেলে ক্ষতিপূরণ, বিস্ফোরণে ক্ষতিপূরণ। মানুষকে টাকা দিয়ে আর কত মুখ বন্ধ করে রাখবেন? যে বাচ্চা দুটো গুরুতর আহত হলো তাদের কী কোনো ক্ষতিপূরণ হবে? টাকা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি ঘর পুনরুদ্ধার করে দেওয়া যাবে অথচ বোমা শিল্পগুলিকে মান্যতা দেওয়া বন্ধ করা যাবে না।

তদন্তের ভিত্তিতে জানা গেছে, রাতের অন্ধকারে দেবকগ্রাম থেকে লরি ভর্তি করে আতসবাজির ভেতরে মাইন বাইরে পাচার হতো। একটি করে বিস্ফোরণ হবে, আমাদের সামনে এইসব তত্ত্ব আসবে, আবার আমরা সব ভুলে রোজনামচায় ডুব দেব, আর সুযোগ করে দেব এই জেহাদিগুলোকে। বিস্ফোরণের জেরে ১০ ফুট গর্ত তৈরি হয়েছে, চায়না বারুদের সঙ্গে পটাসিয়াম ক্লোরাইড, অ্যালুমিনিয়াম ডাস্ট পাওয়া গেছে। সামনে কালীপুজোও ছিল না বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানও নয়, তবে এত বারুদ একসঙ্গে একটি বাজি কারখানায় মজুত ছিল কেন? এই কিছু সাধারণ প্রশ্ন সকলের মনেই উঠছে, কিন্তু তৃণমূলের মহাসচিব থেকে মাননীয়া কারোর কাছে কোনো সদুত্তর নেই। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব আই এন এ-র তদন্ত দাবি করেছে সিআইডি-র উপর ভরসা করা যাচ্ছে না। তারা নিজেদের অপদার্থতা বারংবার প্রমাণ করেছে।

পুলিশ ও বোম স্কোয়াডের অপদার্থতা, প্রযুক্তিগত অশিক্ষা যথেষ্ট দায়ী। তাদের বারুদ নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া যথার্থ ছিল না। অপারদর্শিতা, অপেশাদারিত্ব বহু অংশে দায়ী। যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এত বড়ো মাপের বিস্ফোরণ হয়তো এড়ানো যেত, তবে প্রকৃত সত্য উদঘাটন হতো না। আজ বোমা শিল্পে এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতা, ধর্ষণে এগিয়ে রাজ্য, কাটমানিতে এগিয়ে রাজ্য। প্রশাসন কঠোর হাতে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ না করলে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভুল সংশোধন তো নয়ই, ওই বাজি কারখানার মালিক নিজে একজন সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। জেহাদিদের গায়ে রাজনীতির রং লাগিয়ে তাদের বাঁচানোর বৃথা চেষ্টা করা মানে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। স্থানীয় মাদ্রাসাগুলিও সন্দেহের বাইরে নয়। খাগড়াগড় কাণ্ড যার জ্বলন্ত উদাহরণ। নীরবে নিভৃতে গোপনে অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে এইসব জেহাদিরা তাদের সন্ত্রাসবাদী কাজ করে যাচ্ছে। মানবজাতির শত্রু জেহাদিদের নিষ্কাশন করার কাজ যদি প্রশাসন গ্রহণ না করে তবে জনতার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবেই। দিকে দিকে জেহাদিদের মডিউলগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠার আগেই তাদের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করা দরকার। কথায় বলে নিজের ঘরে আগুন না লাগলে তার ভয়াবহতা ঠাহর করা যায় না—আজ সেই বিপদ আসন্ন। সময় আছে সতর্ক হোক প্রশাসন না হলে তাদেরও অস্তিত্ব রক্ষা করা মুশকিল।

অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ হোক। প্রতিষ্ঠিত হোক সত্যের মর্যাদা। ঘৃণ্য জিহাদি তাণ্ডবের বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জাগরিত হওয়ার সময় এসেছে। আর তাতেই এই ভয়ানক দুরভিসন্ধির রাজনৈতি-জেহাদি আঁতাত সমূলে বিনষ্ট হবে।

পুলিশি হেফাজতে বাজি কারখানার মালিক নুর হোসেন।

গঙ্গারামপুর সরস্বতী শিশুমন্দিরের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন

সাংস্কৃতিক-শারীরিক-বৌদ্ধিক চর্চা ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটল বিদ্যাভারতী পরিচালিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর সরস্বতী শিশুমন্দিরের রজত জয়ন্তী বর্ষের বর্ষব্যাপী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের। ২৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর তিনদিন ছিল জেলা এবং উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির প্রদর্শন। দক্ষিণ দিনাজপুরের খন, গম্ভীরার পাশাপাশি কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান ছিল মুল আকর্ষণ। এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিদ্যা ভারতী পরিচালিত বিভিন্ন শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেরদের দ্বারা পরিবেশিত হয় 'মাখন চুরি', 'গোপুরম'-এর মতো প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমগ্র বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন বালুরঘাট লোকসভার সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার-সহ বিশিষ্ট জনেরা। রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে গত বছর ১২ জানুয়ারি গঙ্গারামপুর পৌর এলাকায় স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়। ২৬ জানুয়ারি অবহেলিত এলাকায় শিশু সংস্কার কেন্দ্র চালু করা হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি শিশু মন্দিরের উদ্যোগে পৌরসভার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় স্বচ্ছতা অভিযান চালানো হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি মাতৃপূজন, ১৬ মার্চ অতিথি পূজন অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ এপ্রিল সামাজিক সমরসতা দিবসে সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানী-গুণী জনকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগদিবসে শিশু মন্দির প্রাঙ্গণে বড়ো যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এতে পতঞ্জলি যোগশিবিরের প্রশিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। ৭ জুলাই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা এবং শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেদের চারাগাছ বিতরণ করা হয়। ১১ সেপ্টেম্বর আয়োজিত রক্তদান শিবিরে শিশুমন্দিরের আচার্য-আচার্যা, পরিচালন সমিতির সদস্য ও অভিভাবকরা রক্তদান করেন। অনুষ্ঠান সুচারু রূপে সম্পন্ন করার দায়িত্বে ছিলেন রজত জয়ন্তীবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির সভানেত্রী ড. অশ্রুকণা দত্ত, উদ্‌যাপন সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক অভিজিৎ সরকার, পরিচালন সমিতির সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, সদস্য বলরাম দাস প্রমুখ।

টালা ঝিল পার্কে মৌন প্রতিবাদ মিছিল

অপরাধীকে গ্রেপ্তারে অবহেলা ও গড়িমসির বিরুদ্ধে উত্তর কলকাতার টালা ঝিল পার্কে গত ১১ জানুয়ারি এলাকার প্রতিবাদী মানুষজন এক মৌন মিছিলে শামিল হন। ২০১১ সালের এই দিনেই টালা ঝিল পার্কে ভিতরে রহস্যজনক গাড়ির ধাক্কায় নিহত হয়েছেন প্রাতর্ভ্রমণকারিণী আরতি সেনগুপ্ত। মহামন্য কলকাতা হাইকোর্ট এই ঘটনাকে রহস্যজনক আখ্যা দিয়ে পুলিশকে সঠিক তদন্ত করে চার্জ গঠনের নির্দেশ দেয়। দীর্ঘ টালবাহানার পর পুলিশ চার্জ গঠন করলেও কোনো এক অজানা কারণে অপরাধীকে গ্রেপ্তারে নিস্পৃহতা দেখাতে থাকে। কিন্তু থেমে থাকেনি প্রতিবাদী মানুষদের নিয়ে আরতিদেবীর একমাত্র সন্তান কিংশুকবাবুর লড়াই। জন সমাজ কল্যাণ সঙ্ঘ নামে সামাজিক সংগঠন তৈরি করে তিনি ন্যায়বিচারের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ১১ জানুয়ারি এলাকার প্রতিবাদী মানুষ পার্কের ভিতর আরতিদেবীর স্মৃতিফলক প্রাঙ্গণ থেকে মৌনমিছিল করে এলাকার ২,৩,৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড পরিক্রমা করে। মিছিলে পা মিলিয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশনের পূজ্যপাদ স্বামী ধর্মস্বরূপানন্দ মহারাজ।

দিনহাটায় রাষ্ট্রবাদী নাগরিক মঞ্চের পদযাত্রা

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে দিনহাটা রাষ্ট্রবাদী নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে গত ৯ জানুয়ারি কোচবিহার জেলার দিনহাটা শহরে বিশাল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের রেলস্টেশন চত্বর থেকে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রেলস্টেশনেই শেষ হয়। এদিনের পদযাত্রা থেকে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানানো হয়। পদযাত্রায় শরণার্থী মানুষদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিল। পদযাত্রায় পা মিলিয়েছেন কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ প্রচারক অঙ্কুর সাহা, রাষ্ট্রবাদী নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক দেবব্রত ঘোষ প্রমুখ।

বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের স্বামীজী স্মরণে বিশাল শোভাযাত্রা

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন গত ১২ জানুয়ারি বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে এক সুন্দর ও বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রা স্বামীজীর প্রতিকৃতি ও ব্যানার সহ একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো, স্কাউট ব্যান্ড-সহ বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। সহযোগিতায় এগিয়ে আসে বেহালা বিবেক ভারতী, এবিপিটিটিএ প্রভৃতি সংগঠন। শোভাযাত্রা বেহালা ১৪ নং বাসস্ট্যান্ডের রায়নগর মাঠ থেকে শুরু হয়ে সখেরবাজার চণ্ডীমাতার মাঠে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় যুবক-যুবতীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

মালদহের গাজোলে মতুয়া মহাসম্মেলন

নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে মালদা জেলা মতুয়া মহাসঙ্ঘের আহ্বানে গত ৯ জানুয়ারি গাজোল বিএসএসের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় মতুয়া মহা সম্মেলন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রচুর জনসমাগমে মাঠ ভরে উঠেছিল। জেলার পদাধিকারীরা মতুয়া ধর্মদর্শনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর পরিবারের ষষ্ঠতম বংশধর কোচবিহারের সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। তিনি সভায় ঘোষণা করেন স্বাধীনতার ৭০ বছর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য মতুয়া সব অন্য শরণার্থীরা ভারতীয় নাগরিকের মর্যাদা পেলেন। সভা থেকে এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

শ্রী ডীডওয়ানা নাগরিক সভা ও নাগরিক স্বাস্থ্য সঙ্ঘের চক্ষু অপারেশন শিবির

গত ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার শ্রী ডীডওয়ানা নাগরিক সভা এবং নাগরিক স্বাস্থ্য সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে তারক প্রামাণিক রোডের সঙ্ঘ নেত্রালয়ে এক চক্ষু অপারেশন শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ১০০ জনের বেশি রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করে আপারেশন করা হয়। শিবিরে প্রধান আতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থান পরিষদের অধ্যক্ষ বিশিষ্ট সমাজসেবী শার্দূল সিংহ জৈন। প্রধান বক্তা রূপে ছিলেন বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘ ট্রাস্টের অধ্যক্ষ নন্দগোপাল বাঙ্গড়, শ্রী ডীডওয়ানা

নাগরিক সভার অধ্যক্ষ অরুণ প্রকাশ মল্লাবত এবং সচিব হরিশ তিওয়ারি, ম্যানেজিং ট্রাস্টি সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, উপাধ্যক্ষ বিনোদ কুমার গুপ্তা ও ইন্দ্র কুমার দাগা, সচিব ললিত আগরওয়াল প্রমুখ।

পাকড়িতে সরস্বতী শিশুমন্দিরের নবনির্মিত ভাবনের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ৪ জানুয়ারি হুগলী জেলার পাকড়ি দাশরথিদেব যোগেশ্বর সরস্বতী শিশুমন্দিরের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সোৎসাহে সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের প্রাদেশিক সহ সম্পাদক তপন ভড়, সমিতির অন্যতম সদস্য ভগবতী প্রসাদ জালান, অনুদাতা হাইটেক সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের কর্ণধার বিকাশ আগরওয়াল, হুগলী জেলা সমিতির সভাপতি আশুতোষ দে, জেলা প্রমুখ বিজয় রায়, শিশুমন্দিরের বর্তমান সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সম্পাদক চন্দ্রকান্ত ঘোষ, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বাসুদেব ঘোষ-সহ পূর্বতন ও বর্তমান সদস্যগণ, আচার্য-আচার্যাগণ, শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেরা এবং তাদের আভিভাবকগণ। আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটনের পর মঞ্চাসীন অতিথিবর্গকে বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেরা স্তোস্ত্র, মন্ত্র, নৃত্য-গীত এবং যোগাসনের সমন্বয়ে একটি সুন্দর সামস্কৃতিক পরিবেশের উপস্থাপনা করে। শ্রীজালান ও শ্রী আগরওয়ালা স্বহস্তে ভাই-বোনেদের পোশাকপরিচ্ছদ এবং আচার্য-আচার্যাদের পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিশুমন্দিরের আচার্য বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংস্কার ভারতী গাজোল শাখার স্বামীজী স্মরণ

গত ১২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় উত্তরের সংস্কার ভারতী গাজোল শাখার উদ্যোগে চঞ্চল প্রসাদ চক্রবর্তীর বাসভবনে স্বামীজী স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণের পর সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন জয়া চক্রবর্তী, পুষ্প সরকার, রাজকুমার গুইন, পরেশ চন্দ্র সরকার, চঞ্চল প্রসাদ চক্রবর্তী ও অজয় নন্দী। প্রবন্ধ পাঠ করেন চঞ্চল প্রসাদ চক্রবর্তী, আবৃত্তি করেন শ্রেয়া বিশ্বাস। স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন দিকের আলোকপাত করেন গাজোল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী। করচ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকান্ত বৈদ্য, মশালদিঘি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভাগবত রায় ও পুষ্প সরকার। একক গীত পরিবেশন করেন পরেশ চন্দ্র সরকার এবং প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী জয়া চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজকুমার গুইন ও চঞ্চল চক্রবর্তী।

পূর্ব ভারত বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং মেলা

কলকাতায় বিড়লা শিল্প এবং কারিগরি সংগ্রহশালার ময়দনে (বিআইটিএম) গত ১৪ থেকে ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব ভারত বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং মেলা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এই মেলার উদ্বোধন করেন। মেলায় পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের ১১ টি রাজ্য থেকে ১৫৩ টি বিদ্যালয়ের ৩৬৭জন ছাত্র-ছাত্রী ১৬০ টির বেশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মডেল নিয়ে প্রদর্শন করে। রাজ্যপাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্র সরকার উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির বিজ্ঞান, কলা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও জৈব চাষের ওপর জোর দিচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলকাতার ব্রিটিশ হাই কমিশনার মি. নিক লো বলেন, ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নে সেতুবন্ধনের কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই দেশের মধ্যে বহু মিল রয়েছে। বিজান, গবেষণা, প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে ব্রিটেন আগামীদিনে ভারতে বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি করবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান সংগ্রহশালাগুলির জাতীয় পর্ষদের মহানির্দেশক ডিএ চৌধুরী, বিআইটিএম-এর অধিকর্তা ভি এস রামাচন্দ্রন, সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

শীতল ষষ্ঠী নবান্নের মতোই এক শস্য উৎসব

নন্দলাল ভট্টাচার্য

'নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্র মুখরা পৃথিবী,/ অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী'--- কবির মানসলোকে এইভাবেই চিত্রিত এ পৃথিবী। স্নেহময়ী মাতা এ বসুন্ধরা। জীবপালিনী তিনি। তিনি ধরণী— ধাত্রী, তিনি সকলের। স্নেহময়ী মায়ের মতোই আপন বক্ষের অমৃত পীযূষে পরিপালন করেন তিনি সমস্ত প্রাণীকে। পত্রে পুষ্পে, ফলে পল্লবিত এই পৃথিবী সকলের প্রতিই সমান উদার। সকলের প্রতিই এই ধরার সমান দৃষ্টি, সকলের জন্যই 'শ্যামশস্য হিল্লোলে' ধ্বনিত 'অকথিত এই বাণী— আমি আনন্দিত'।

পৃথিবীর এই আনন্দ প্রতিমুহূর্তেই নন্দিত করে তার সন্তান, মানুষকে। পৃথিবীর দানকে মাথায় তুলে নেয় মানুষ। তারও মুখে ওই একই সুরে রণিত সেই সত্য— 'আমারে তুমি অশেষ করেছ'। তোমার স্নেহের দান তোমার ওই সবুজ শ্যামল শস্যরাজিকে গ্রহণ করি আমরা প্রসন্ন চিত্তে আনত মস্তকে। তুমি আমাদের পাগল করেছ। তাই গ্রহণ করো আমাদের প্রণতি। কৃষিনির্ভর ভারতের জনজীবনের প্রতিটি মুহূর্তই একান্ত কৃতজ্ঞতায় প্রথম ওঠা ফসলের অগ্রভাগ নিবেদন করে তাদের প্রাণের দেবতাকে। মন্ত্র তার, যা দিয়েছো আমাদের তারই অগ্রভাব গ্রহণ করে অমৃতময় করো আমাদের অন্নকে। আমাদের সুস্থ রাখো— শান্তিতে রাখো— স্নিগ্ধ করো প্রতিটি মুহূর্তে।

হেমন্তের শেষে নবীন শস্যে নবান্ন দিয়ে যে নিবেদন তারই একটি রূপ যেন ফুটে ওঠে 'গোটা সেদ্ধ' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সরস্বতী পুজোর ঠিক পরের দিন মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে 'শীতল ষষ্ঠী' পালনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গলার মায়েরা প্রণাম জানান জীবনধাত্রীকে। নতুন ওঠা নানা সবজি শুদ্ধ ভাবে সেদ্ধ করে নিবেদন করেন দেবতাকে। সবজি থেকে সবকিছু সেদ্ধ করা হয় গোটা গোটা ভাবে আগের রাতে— ভাতও ভিজিয়ে রাখা হয় জলে। পরদিন আর বাড়িতে উনুন জ্বলে না। সেদিন ওই পান্তাভাত আর গোটা সেদ্ধ নিবেদন করা হয় শীতল ষষ্ঠীর উদ্দেশে। তারপর সেই প্রসাদ দেওয়া হয় পাড়া পড়শিদের। সেদিন সকলের আহার ওই শীতল প্রসাদেই।

এই গোটা সেদ্ধ বা শীতল ষষ্ঠী পালনের অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক বাড়ির মহিলারাই। সবকিছুর জোগাড়যন্ত্র চয়নে তাঁরাই। বহু জায়গায় পুরোহিত ডেকে নয়, নিজেরাই নদী বা পুকুরে স্নান করে নিবেদন করেন দেবী ষষ্ঠীর উদ্দেশে। সরল বিশ্বাস, এই শীতল ষষ্ঠীর দিনে গরম কিছু খেলে ক্রুদ্ধ হন দেবী ষষ্ঠী। সংসারে নেমে আসে দুর্ভাগ্য। কিন্তু পবিত্র নতুন শস্য ও আনাজপাতি দেবীকে নিবেদন করলে খুশি হন দেবী। তাঁর কৃপায় সম্পদে, সুখে, শান্তিতে উথলে ওঠে সংসারের পাত্র। শীতল ষষ্ঠী তাই পালিত হয় বাঙ্গলায় প্রায় প্রতিটি ঘরে। বিশ্বাস, শীতল ষষ্ঠীতে গোটা সিদ্ধ খেলে বসন্তকালীন রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকে মানুষ। তাই শীতল ষষ্ঠীর এই ব্রত পালন করা হয় বিশেষ করে পল্লিবাঙ্গলার ঘরে ঘরে। সমাজ বিজ্ঞানীরাও তাই যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গেই বলে থাকেন, এটি হলো একটি উন্নত মানের রোগ প্রতিষেধক। গোটা সেদ্ধ মানুষের পরমায়ুকে বাড়িয়ে দেয়।

যতটুকু যা জানা যায়, তার থেকে বোঝা যায় এই শীতল ষষ্ঠী ব্রত পালন বা গোটা সেদ্ধ ভোজন বাঙ্গলার সমাজজীবনকে রক্ষা করে মরসুমি আধিব্যাধি থেকে। বহু ব্রতকথার মতোই শীতল ষষ্ঠীর ব্রতকথাতে রয়েছে পল্লি বাঙ্গলার সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবনের সদা-চলমান রূপ। প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতার এক বিনম্র নিদর্শন যেন এই ব্রতকথা। সেই সঙ্গে জানা যায় একটি দরিদ্র পরিবারের ঈশ্বরের প্রতি অকপট বিশ্বাস এবং গভীর নিষ্ঠার কথা।

অন্যান্য মেয়েলি ব্রতকথার মতোই শীতল ষষ্ঠী ব্রতর আখ্যান ভাগও একবারেই ঘরোয়া এবং আন্তরিক বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় ভরা। এই ব্রত কাহিনি যেন বাঙ্গলার পল্লিজীবনের স্নিগ্ধ রূপটিরই অপরূপ উদ্ভাস।

এক গ্রামে ছিল এক গরিব ব্রাহ্মণ দম্পতির বাস। একমাত্র ছেলে আর তার বউকে নিয়ে তাদের অভাবী অথচ সুখী পরিবারে ছিল সন্তোষ এবং শান্তি। তবে ওই সুখী পরিবারেও ছিল একটাই দুঃখ, বিয়ের এতদিন পরেও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দেখতে পাননি কোনো নাতি- নাতনির মুখ। আর তাই মনপ্রাণ দিয়ে পরিবারের সকলেই ডাকেন মা ষষ্ঠীকে। সকলেরই সকাতর প্রার্থনা, দয়া করো মা। একটি সন্তান আসুক আমাদের ঘরে।

পরিবারটির নিষ্ঠা, ভক্তি আর বিশ্বাস দেখে খুশি হন মা ষষ্ঠী। তাঁর কৃপায় অবশেষে গর্ভবতী হয় ব্রাহ্মণীর ছেলের বউ। অফুরন্ত খুশির তুফান ওই পরিবারে। সকলেই অপেক্ষা করতে থাকে এক নবজাতকের জন্য। অপেক্ষা হয়ে ওঠে

অন্তহীন। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যায় কিন্তু ব্রাহ্মণীর ছেলের বউয়ের সন্তান আর ভূমিষ্ঠ হয় না। সুখের সংসারে গাঢ় হয় দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। ব্রাহ্মণী দিন-রাত ধরনা দিয়ে পড়ে থাকেন মা-ষষ্ঠীর চরণে। কৃপা চান তাঁর। এরই মধ্যে একদিন বউটি গেছে পুকুর ঘাটে হাতমুখ ধুতে। আচমকাই পা হড়কে পড়ে যায় বউটি। আর তখনই ঘটে এক অঘটন। বউটি ওই পুকুর ঘাটেই প্রসব করে লাউয়ের মতো একটি বড়ো থলে। ভয় পেয়ে বউ ছুটে ফিরে আসে ঘরে। শাশুড়িকে বলে সব কথা। শুনে শাশুড়ি প্রথমটা কী করবেন তা ঠিক করতে পারেন না। তারপর ব্রাহ্মণকে জানান সব। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ সকলকে নিয়ে ছুটে যান পুকুর ঘাটে। গিয়ে দেখেন, একটি কাক ঠুকরে ঠুকরে ছিঁড়ে ফেলেছে থলিটি। তার মধ্যে কিলবিল করছে ছোটো ছোটো একগাদা শিশু।

ব্রাহ্মণের কথায় তাড়াতাড়ি থলেটি বাড়ির ভিতরে আনা হলো। গুনে দেখা গেল ষাটটি ছেলে রয়েছে ওই থলের মধ্যে। মা ষষ্ঠীর কাছে তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন একটি সন্তানের জন্য। কিন্তু তিনি যে কৃপা করে একসঙ্গে ষাটটি সন্তান দেবেন এটা ছিল তাঁদের ধারণারও বাইরে। এখন হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো ষাটটি নাতি পেয়ে আনন্দ আর ধরে না ব্রাহ্মণের। তিনি তোড়জোড় করে তাড়াতড়ি একটি আঁতুড়ঘর বানিয়ে দিলেন। বিধি নিয়ম মেনে ব্রাহ্মণ ছ'দিনের দিন ঘটা করে ষেটেরা পুজো করলেন— ষষ্ঠী পুজো। ষাটটি নাতির জন্য ষাটখানা ঘর বানিয়ে দেন ব্রাহ্মণ। তারপর একে একে নাতিদের নামকরণ, অন্নপ্রাশন হয়। যথা সময়ে চূড়াকরণ এবং উপনয়ন হয়। পৈতে হওয়ার পরই শুরু হয় তাদের বিয়ের তোড়জোড়। আর তখনই ছেলের বউ এক অদ্ভুত বায়না করে বসে। বায়না না বলে বরং 'জেদ ধরে বসে' বলাই ভালো। তার কথা, ষাটটি ছেলের সে বিয়ে দেবে একসঙ্গে। আর বিয়ে দেবে যার ষাটটি মেয়ে রয়েছে তাদের সঙ্গে। বউয়ের এমন অদ্ভুত জেদের কথা শুনে ব্রাহ্মণ বলেন, সর্বনাশ, সে কোথা থেকে পাবো মা। ব্রাহ্মণী বলেন, অদ্ভুত জেদ করছ কেন? সবই মা ষষ্ঠীর দয়া। দেখবে মা ষষ্ঠী আমাদের বউমার জেদ বজায় রাখবেন। ছেলের বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণীও একই ধরনের কথা বলায়— ব্রাহ্মণ কিছুটা বাধ্য হয়েই এক মায়ের ষাটটি মেয়ের খোঁজ শুরু করেন। বহু দেশ ঘুরলেন তিনি। কিন্তু তাঁদের চাওয়া মতো ষাট সহোদরার খোঁজ তিনি পেলেন না।

পাওয়া যে যাবে না, এমনটাই ছিল ব্রাহ্মণির ধারণা। তাই একরকম হতাশ হয়েই বাড়ির দিকে রওনা হন ব্রাহ্মণ। ফেরার পথে তিনি এলেন এক দেশে। আর সেখানেই মা ষষ্ঠীর দয়ায় পেয়ে গেলেন এক মায়ের গর্ভজাত ষাটটি মেয়ের সন্ধান। ব্রাহ্মণ দেখলেন, পুকুর ঘাটে এক মহিলা ষাটটি মেয়েকে স্নান করাচ্ছেন। তা দেখে ব্রাহ্মণ মনে মনে মা ষষ্ঠীকে প্রণাম করে সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ মা, এই মেয়েগুলি কি তোমার? ওই মহিলা বলেন, হ্যাঁ বাবা, কত পাপ করেছিলুম, তাই ভগবান এই গরিব ব্রাহ্মণের ঘরে এতগুলি মেয়ে দিয়েছেন। মহিলাটির সে কথা শুনে ব্রাহ্মণ বলেন, দেখ মা, আমার ষাটটি নাতি রয়েছে। তোমার মেয়েদের সঙ্গে আমার ওই ষাটটি নাতির বিয়ে দিতে চাই। তোমার কোনো আপত্তি নেই তো! না-না, এতে আপত্তি করার কী আছে। যা বললেন, তাতে আপনারা তো আমাদের পালটি ঘর।

তাহলে কথা পাকা হলো তো।

দেখুন, এসব তো আমার কথায় হবে না। বরং আমাদের বাড়িতে চলুন। কর্তাদের সঙ্গে কথা বলুন। আশা করছি কোনোরকম অসুবিধে হবে না। মা ষষ্ঠীর কৃপায় সব ঠিকই হবে। ব্রাহ্মণ মেনে নেন সেকথা। তাই সেই মহিলার সঙ্গে গেলেন তাঁদের বাড়ি। সেখানে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিয়ের দিন পাকা করলেন। তারপর এক শুভদিনে শুভলগ্নে ব্রাহ্মণের ষাটটি নাতির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল ওই মহিলার ষাটটি মেয়ের। নাতবউদের বরণ করে ঘরে তোলেন ব্রাহ্মণী। স্বামী বলেন, দেখলে তো, মা ষষ্ঠী কীভাবে আমার বউমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন।

সরস্বতী পুজোর পরদিন ওই ব্রাহ্মণ দম্পতি খুব নিষ্ঠা ও ভক্তি ভরে মা ষষ্ঠীর। পুজো দিলেন তাঁর কৃপায় ব্রাহ্মণের ঘরে সুখ, সমৃদ্ধি সব যেন উথলে উঠল। ব্রাহ্মণ দম্পতি মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে খুব ঘটা করে শীতল ষষ্ঠীর পুজো করতে থাকেন। কিন্তু সে বছর ব্রাহ্মণীর যেন ভিমরতি হলো। মাঘ মাসে সেবার প্রচণ্ড শীত পড়েছিল। মাঘের শীত বাঘের গায়— ব্রাহ্মণীও হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ঢুকে পড়েন কাঁথার তলায়। সরস্বতী পুজোর পরদিন সকাল থেকে নামে বৃষ্টি। শীতে কাহিল ব্রাহ্মণী নাতবউদের বলেন, এই শীতে আমি আর ঠাণ্ডা জলে নাইতে পারব না। তোমরা আমার জন্য এক হাঁড়ি গরম জল করে দাও। গরম জলে স্নান করে গরম ভাত খাব আমি। তাই শিগগির ভাত চড়াও।

নাতবউরা আর কী করে। শীতল ষষ্ঠীর দিন উনুন জ্বালতে নেই জেনেও তারা ব্রাহ্মণীর জন্য ভাত বসিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণীও গরম জলে স্নান করে গরম ভাত খেয়ে শুয়ে পড়েন। পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখেন বাড়ির বেড়াল-কুকুর থেকে নাতি- নাতবউ সকলে মরে গেছে। ব্রাহ্মণী তো কেঁদে পাড়া মাথায় করেন। পড়শিরা সব শুনে ব্রাহ্মণীকে ছি-ছি বলে নিন্দে গালমন্দ করে ঘরে ফিরে যায়। মরা আগলে একা কাঁদতে থাকেন ব্রাহ্মণী।

মা ষষ্ঠী তখন এক বুড়ির ছদ্মবেশে এসে বলেন, ভালো করে গরম জলে চান করো, গরম ভাত খাও। একথায় ব্রাহ্মণী মা ষষ্ঠীর পা জড়িয়ে ধরে বলে, মা, আমায় ক্ষমা কর। এর একটি বিহিত করো। মা ষষ্ঠীর এবার দয়া হলো। বললেন, এক কাজ করো। তোমার নাতবউরা শীতল ষষ্ঠীর যে ঘট পেতেছে সেখানে ষষ্ঠীর গায়ে যে দই-হলুদ রয়েছে, তা নিয়ে এসে আগে কুকুরের কপালে এবং তারপর বাকি সকলের কপালে ফোঁটা দাও। আর ওই হলুদ ছোপানো সুতো ছেলে আর নাতিদের হাতে তাগা বেঁধে দাও। আর কখনও শীতল ষষ্ঠীর দিনে গরম জলে চান করো না। গরম ভাতও খাবে না। খাবে পান্তা ভাত ও গোটা সেদ্ধ। মা ষষ্ঠীর নির্দেশ মতো ব্রাহ্মণী সবকিছু করে। সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে ওঠে সকলে। ব্রাহ্মণী এবার ছেলেও নাতির হাতে বেঁধে দেয় হলুদ সুতোর তাগা। তারপর খুব ধুমধাম করে শীতল ষষ্ঠীর পুজো করে তারা। এসব কথা চাউর হলো চারদিকে। শীতল ষষ্ঠীর কথা জানতে পারল সকলে। মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে দই-পান্তা, গোটা সেদ্ধ খেয়ে শীতল ষষ্ঠী করার প্রথা চালু হলো চারদিকে। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে শীতল ষষ্ঠী হলো নবান্নের মতোই একটি শস্য উৎসব। এই দিন মরসুমের সবরকম সবজি দিয়ে করা হয় গোটা সেদ্ধ। আর সেইসঙ্গে মেতে ওঠে এক লোকউৎসবে। সেদিন থেকে শীতল ষষ্ঠী হলো নতুন তরিতরকারি সবজি ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন করে সকলের সঙ্গে তা ভাগ করে খাওয়ারও উৎসব। এ এক গণ-লোকোৎসবও বটে। ■

বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে দেবী সরস্বতী

সপ্তর্ষি ঘোষ

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা।।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা।
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যপহা।।

সরস্বতী হিন্দুদের অন্যতম প্রিয় দেবী। শুধু হিন্দুদেরই নয়, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মেও সরস্বতী খুব জনপ্রিয়। ভারতের বাইরে তিব্বত, যবদ্বীপ, জাপান, রাশিয়া, আফগানিস্তানেও সরস্বতীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা আবহমানকাল থেকে বঙ্গপ্রদেশে প্রচলিত। এর সূচনাকাল সঠিক ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও, সরস্বতী পূজার প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। সরস্বতী পূজার দিনটি 'শ্রীপঞ্চমী' নামেও পরিচিত। কথিত আছে, এই দিনে লক্ষ্মীদেবীর (শ্রী) সঙ্গে স্কন্দের বিবাহ হয়েছিল। যেজন্য এই তিথি 'শ্রীপঞ্চমী' নামে অভিহিত হয়। কালক্রমে অবশ্য লক্ষ্মীদেবীর স্থলে দেবী সরস্বতীর জন্য দিনটি খ্যাতিলাভ করেছে।

সরস্বতী বৈদিক দেবতা। বেদে পুরুষ দেবতারই প্রাধান্য। স্ত্রী দেবতার সংখ্যা অল্প। এই বৈদিক দেবীদের মধ্যে প্রথমা ছিলেন 'ঊষা', তার পরেই দেবী সরস্বতী। বেদে সরস্বতীকে বাগ্‌দেবী, ধীষণা, ভারতী প্রভৃতি নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। 'সরস্' অর্থ আলো বা জ্যোতি। অতএব সরস্বতী শব্দের অর্থ আলোকময়ী বা জ্যোতির্ময়ী। জগৎকে তিনি আলো দান করেন। জ্ঞানই প্রকৃত অর্থে আলো বা জ্যোতি। জ্ঞানের প্রকাশেই মানুষের পূর্ণতা। এই জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী।

বেদে 'সরস্' শব্দের একটি অর্থ জল। বৈদিক যুগে সরস্বতী ছিলেন নদীস্বরূপা। সরস্বতীর জল পরম পবিত্র বলে সমাদৃত ছিল। এই সরস্বতী নদীর তীরে আর্যঋষিরা বিভিন্ন দেবতার আরাধনা ও যাগ-যজ্ঞ করতেন। দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদে মানুষের ধর্ম, জ্ঞান, নীতি, শিল্পবিদ্যা বিকশিত হয়েছিল। এই সময় দেশের কৃষি-বাণিজ্যও ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল এবং মানুষের সামাজিক জীবনও উন্নত হয়েছিল।

নদী হয়েও সরস্বতী বৈদিক যুগে জ্ঞান, কলাবিদ্যা, সংগীত, বাদ্য, নৃত্য— এই সমস্ত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হয়েছিলেন। ঋগ্বেদে সরস্বতীর বিবিধ রূপ। তিনি মাতৃশ্রেষ্ঠা, তিনি নদীশ্রেষ্ঠা, তিনি দেবীশ্রেষ্ঠা। বৈদিক যুগে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল না। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতীর কর্ম ও মহিমার কথা উল্লিখিত হলেও তাঁর অবয়বের কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না।

পরবর্তীকালে যখন সরস্বতী দেবীর মূর্তি কল্পনা করা হলো, তখন তাঁর জ্যোতির্ময় গাত্রবর্ণ বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্যোতক রূপে শ্বেতবর্ণ কল্পিত হলো। সরস্বতী শ্বেতবর্ণা, শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্টা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, শ্বেতবর্ণের অলংকারে বিভূষিতা, শ্বেতচন্দনে চর্চিত তাঁর অঙ্গ এবং তাঁর বাহন হংসের বর্ণও শ্বেত। সরস্বতীর হস্তে ধৃত পুস্তক এবং বাদ্যযন্ত্র বীণাও শ্বেতবর্ণ। তাই তিনি প্রকৃত অর্থেই 'সর্বশুক্লা সরস্বতী'।

সরস্বতী পূজার মন্ত্রে বলা হয় 'বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে'। বীণা সুরের প্রতীক এবং পুস্তক জ্ঞানের প্রতীক।

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আপামর বাঙ্গালির গৃহে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী নিষ্ঠা সহকারে ও সাড়ম্বরে পূজিতা হন। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

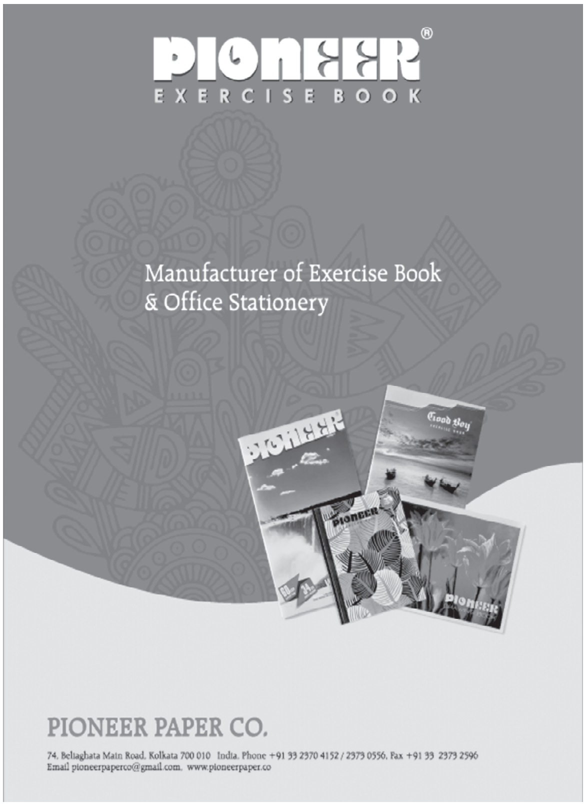

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

চলো কলকাতা

শেখর সেনগুপ্ত

তিসি পাসোয়ানের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কাঁপছে। অর্থাৎ তার মধ্যে যে ভয় ও অনিশ্চয়তাবোধ অনেক দিন আগেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বহুবার চেষ্টা করেও তা অতিক্রম করতে সে ব্যর্থ। সে যখন ইটভাটা থেকে বেরিয়ে আসছে, চারিদিকে তখন শেষরাতের শুনশান আবছা আলোর মেদুরতা। ভবঘুরে ও অসামাজিকদের সমান্তরাল প্রশাসনও থিতিয়ে আছে। তার মতো কুরূপা যুবতীকে কেউ কুপ্রস্তাব দিতে কিংবা রসিকতা করতে অন্তত এই সময়ে আসবে না। তবুও বলা তো যায় না। কোথাও কোনো অদৃশ্য বিপদ হয়তো থাবা এখনও চাটছে। কাল রাতে ইটভাটায় চার-চারটে নেকড়ে তাকে ধর্ষণ করবার পর আর আস্থা বলতে কিছু নেই। আস্থার সঙ্গে অনাস্থার সম্পর্ক তো বিলকুল আদায়-কাঁচকলায়। ধর্ষকরাও নির্ঘাত বুঝেছিল, এ মেয়ে আর যাই করুক, থানা-পুলিশ করতে যাবে না জানের ভয়ে।

বাইরে কোথায় যেন পাখির কুজন। কানে আসতেই ইটপাতা বিছানা ছেড়ে ব্যথাভরা শরীরটাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে তিসি। গতকাল দিনের বেলায় ঘণ্টা ছয়েক তাকে কী মেহনতটাই না করতে হয়েছে! মৃদুমন্দ বাতাস এক ফোঁটা ঘামও শুষে নিতে পারেনি। প্রচুর— প্রচুর কাদামাটিতে বালতির পর বালতি বালি ঢেলে তার ওপর লাফালাফি করে প্রায় শুকনো খড়খড়ে করে রাখতে হয়েছে। এরপর ওই গুলিকেই ছাঁচে ফেলে ইটের আদল দেওয়া এবং ধিকি ধিকি আগুনের গহ্বরে ঠেলে দিয়ে রং বদলে নিরেট রূপান্তর ঘটানো— এই কাজগুলি করবার জন্য রয়েছে আরও গণ্ডা দেড়েক লোক। সবার ওপরে মালিক কাম ম্যানেজার তিনকড়ি তিওয়ারি, পান থেকে চুন খসলেই ইটের ভাটায় মহা অশান্তি লাগিয়ে দেবেন। বাইরের দুনিয়ায় যাঁর যত সহবত, ভাটায় ঢুকলেই তাঁর অমন আগুনে ঝংকার বিস্ময়কর। তিসি কিন্তু মালিকের আস্থা পেয়েছে কাজে ফাঁকি দেয় না বলে। এ গুণ তিসির মধ্যে এনেছিল তার গর্ভধারিণী মা। মায়ের কর্মকাণ্ড বিস্মরণে হারিয়ে যাবে না কোনও দিন। সেই গতর খাটানোর সূচনা কাকভোরে, বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় পা দিয়ে দু'বার ঠোকা দেবে মরদকে; তারপর লেড়কার মাথায় হাত রেখে ভুরু কোঁচকাবে লেড়কির সুরত দেখে— দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ মতলববাজও এ মেয়ের দিকে নেক নজর দেবে না। তিসি দেখতে এমন কুৎসিত হলো কেন? বাবা-মায়ের যা কিছু জবরজং সবটাই ও পেয়েছে। মায়ের ট্যারা চোখ ও মোটা ঘাড়, বাপের রং ও চর্বি। কোনও নারীপাচারকারীও হাত বাড়াবার বদলে ভিন্ন অছিলায় উল্টো মুখে হাঁটা দেবে।

এহেন যুবতীও কিনা ধর্ষিতা হয়! একজনের দ্বারা নয়। চার-চারজন। দুটো জোয়ান। বাকি দুটোকে বুড়োও বলা চলে। আক্রান্ত অবস্থায় তিসি কিন্তু প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি। কিছুটা অবাক হয়ে দেখছিল একজনের পর আর একজনকে। এরা কোনওদিন কোনও মহিলার প্রতি অনুরক্ত হতে পারবে না। তবুও—। কী যে খিদে ওদের!

সময়টা তো আর হঠাৎ নেমে আসেনি। কিছুদিন আগে মনের দুঃখে তিসিকে বাবা-মায়ের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। নিত্যনৈমিত্তিক নির্যাতন, যেন দাঁড়িপাল্লার দুইদিকে ছেলে ও মেয়েকে বসিয়ে গুরুত্বের নির্যাস গ্রহণ, গুঁতো খাবার পরও ট্যাঁ-ফো চলে না, তার নাভি ও পেটের চর্বি নিয়ে মায়ের কত যে অস্থির মন্তব্য, ভ্যানচালক বাপের হাঁটুতে আস্তে আস্তে মালিশ করবার সময় লাথ- খাওয়া অবলা জীবের মতো ছারপোকা গিজগিজ মাদুরে কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে পড়বারও অধিকার তার ছিল না। রোজ রাতে তাকে নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী কাজিয়া! মায়েরও খেয়াল থাকত

না, নিজের গর্ভজাত সন্তানকে নিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে কী সব বিষাক্ত কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে স্বামীর দিকে। কেউ কারোর চেয়ে কম নয়। সংসারে অভাব যত বাড়ে, ততই তারা অশান্ত— পারলে হাতুড়ি ঠুকত একজন অপরজনের মাথায়। অবশেষে সেই রাতে বাপের ভয়াল ঘোষণা,— তার ঔরসে নাকি তিসি পাসোয়ানের নির্মাণ নয়। নির্ঘাত লাম্পট্যের ফসল। আর্তনাদকে আর চেপে রাখা গেল না। চোখের পলকে তিসির শপথ, আজ রাতেই ঘর ছাড়বে। ভোরের অপেক্ষায় মরার মতো পড়ে থাকবে না। দুপুরে তেড়েফুঁড়ে বৃষ্টি হয়েছিল। বস্তির নালাগুলি তখনও কম-বেশি টইটম্বুর। তিসি গলি থেকে সদর রাস্তায় পশ্চিমমুখী। শুনেছিল, এই পথ ধরে টানা হাঁটতে পারলে রেলস্টেশন পৌঁছান যায়। তার মতো অনেকেই হাঁটে। পুলিশ জেরা করতে আসে না।

হাঁটতে হাঁটতে সকাল। কচি কলাপাতায় রোদ। সে তখন যেখানে পৌঁছেছে, তার ডান দিকে ইটের ভাটা। কী মনে হতে তিসি ভাটার চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই তিনকড়ি তেয়ারির মুখোমুখি। শুরু হয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

'কীরে বেটি, এলি কোত্থেকে?'

'সাতপাত্তি মহাল্লা।'

'উরি বাপ। সে তো বহুত দূর। কাম খুঁজছিস বুঝি?'

'সাই বাত।'

'ভাটায় করবি?'

'আপনার মেহেরবানি।'

কাজ তো জোগাড় হয়ে গেল। খানাপিনা সমেত দৈনিক পঁচিশ। কিন্তু যেটা বিপজ্জনক, তা হলো, ভাটায় আর কোনও মেয়ে নেই। তদুপরি তিসির পক্ষে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরা অসম্ভব। এখানেই খানা, এখানেই শয়ন। পাহারাদার আছে। পুরসভার অফিসটাও অদূরে। তবুও এর চেয়ে ফুটপাতে রাত কাটানো অধিক নিরাপদ। রাস্তায় প্রচুর কুকুর, বেড়াল। তাদের নীতিবোধ মানুষের চেয়ে তাজা। অর্ধেক রুটির জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারি করলেও পাহারা ঠিক দেবে।

ভাটামালিকের ক্ষীণ দ্বিধা, 'তু' জেনানা।'

'আমাকে কেউ জেনানা ভাবে না। আমি নিরাপদ।'

তিনকড়ি তিওয়ারির দমকা হাসিতে সেই মুহূর্তে প্রায় জনশূন্য ইটের ভাটা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

কাজ তো নয়, বিলকুল খণ্ডযুদ্ধ। মন-প্রাণ দিয়ে কাজ শুরু করেছিল তিসি। নিজের গতর খাটিয়ে উপার্জন। এই স্বস্তিটাই আলাদা। আধপেটা বা উপোস করে থাকবার প্রশ্নই ওঠে না।

তথাপি প্রথম রাত থেকেই কেমন একটা ছমছমানি। দেড়গণ্ডা মজুর বিদায় নেবার পর দারোয়ান হরিশঙ্করের উদয়। বেটা বেয়াক্কেলে। মাঝে মাঝে দোস্তদের ডাকে। চুল্লুতে মজে গিয়ে দৃষ্টি হারিয়ে বসে। তারা যে পুরুষ এই গুমোরেই কয়েক হাত দূর থেকে মাপতে থাকে তিসিকে। জেনানা ঘটিত বহু অভিজ্ঞতা তারা গুলে খেয়েছে। কিন্তু উটা কী জেনানা? এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে গিয়েই শেষমেশ ধর্ষণ। একজন নয়। চার-চার জন।

সে তিসি পাসোয়ান। পুলিশকে পাকড়াবে না। থানায় ঢুকে বিবৃতি দেবে না। কেবল দেহময় অনুভূতি নিয়ে আবার পথে নামল। শহরতলি এখনও ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতায়। বন্ধ ঘর-বাড়ি, দোকানপাট বুঝি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। তিসির বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কাঁপছে। কেন রে বাপু এখনও ভয় ও অনিশ্চয়তাবোধ? চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। এ ব্যাপারে সে বরাবর চৌকস। উবু হতে গেলে চর্বির বাধা, এ রকম শরীর নিয়েও সে মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারে আর তাতেই সে কী খুশি! সেই লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা বেঢপ চেহারার যুবতী ঠিক-ঠিক ভীত-সন্ত্রস্ত না হলেও নির্ভয় আশ্রয় চাইছে। কোথায় সেই আশ্রয়?

কোমরে গোঁজা একশো টাকা থেকে চা-পাউরুটি কিনে খেতেই তেইশ টাকা ফতুর। হাঁটতে হাঁটতে দুপুর। অবশেষে রেলস্টেশন। ঢোকার মুখে সস্তার থালি খেল তিসি। খরচ হলো আরও তিরিশ। একসারি নিস্তব্ধ কামরা অপেক্ষা করছে ইঞ্জিনের জন্য। কারোর ব্যস্ততা নেই। খোদ চেকারের গলায় চিরন্তনী চেতনের গুনগুনানি। হঠাৎ কাঁধে কার হাত। চমকে ঘুরে তাকায় তিসি। ওমা, এ যে জগু চাচা! এককালে বাবার দোস্ত ছিল, ভ্যানও চালাত, তারপর কোথায় যে দিল ডুব। সৌরমণ্ডলের নক্ষত্র হতে চেয়েছিল বোধহয়। তার আন্তর-জীবনে ছিল একটাই খোয়াব,— রুপেয়া কামাতে হবে। বহত রুপেয়া; এর জন্য মহা বেয়াদপ হতেও সে রাজি।

স্টেশন চত্বরে পাশাপাশি বসে তিসির সব কথা শুনল জগু চাচা। তারপর তার ভরাট কণ্ঠস্বর থেকে বেরিয়ে আসে, 'ট্রেন পকড়কে কলকাতা যা। বহুত কুছ মিলেগা।'

'বহুত কুছ!'

জগু চাচা হাত নেড়ে নেড়ে ব্যাখ্যা করে। তিসিও থতমত খাবার মেয়ে নয়। মন দিয়ে শুনছে। কপালে চিন্তার ভাঁজ। গলায়-বুকে বিজবিজে ঘাম। এই সবজান্তার একটা কথাও সে উড়িয়ে দেবে না।

'...তিসি, তোর এই নাদুসনুদুস চেহারা কলকাতার খারাপ পাড়ায় কদর পাবে না। তুই রাত কাটাবি কোনও বড়ো ব্রিজের তলায়। হাত পাতলে কিছু মাল পাবিই।... তারপর পোস্তা, বড়াবাজার। কাম মিলবে জরুর। পাথরকে গুড়ো করবি। দোকানি তা চাল-ডালে মেশাবে। টাকা পাবি।...

জগুচাচার ফিচেল হাসি স্পষ্টতর হয়, তিসির কোমরে কনুই ঠেকিয়ে খোঁচা মারে, 'খেয়াল রাখবি, সরকার গড়েছে যে দল, তাদের কোনও মিছিল যাচ্ছে কিনা। যদি যায়, তুইও ওই মিছিলে পা মেলাবি। গলা ফাটাবি। অনেক রকম সুবিধা পাবি। তোর খিদে আরও চাগিয়ে উঠবে রে।'

'যদি দেখিস, গঙ্গার পাড় থেকে কিছু লোক মাটি কেটে তুলছে, তুইও ওদের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিবি। মাল আসবে। আবার যদি দেখিস, খাদন কে খাদান বালি তোলা হচ্ছে, লাফিয়ে নেমে পড়বি ওই দলে। রুপেয়ার অভাব থাকবে না। মেহনত আর পয়সার জোরে তুইও রোগা-পাতলা খাপসুরত অওরত হয়ে উঠবি রে, তিসি।'

জগুচাচার অট্টহাসিতে তিসির অমন ওজনদার দেহও যেন নড়বড় নড়বড় করে। আনমনা টিকিট চেকার চনমনে হয়ে ওঠেন। শক্তপোক্ত চেহারার কুলিদের ছোটাছুটি নজরে আসে। গুটি কয়েক কাক স্টেশন চত্বরে নিজেদের বসবাস নিয়ে সচেতন হয়, উড়ান দেয়। কোত্থেকে এগিয়ে আসছে মানুষের দল। জুতসই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে তারা। তিসির বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল কাঁপে। চোখ হয়ে যায় গোল গোল। দাপিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ছে কলকাতাগামী ট্রেন।■

অমলিন পুষ্পলতা

রূপশ্রী দত্ত

আজকে কলেজে কিছুটা দেরিতে ক্লাস অধ্যাপিকা সীমা রায়ের। মেয়ে সুতীর্থাও এসেছে বাপের বাড়িতে। সঙ্গে তার ছ' মাসের মেয়ে রুম্পা। আর রুম্পার সহচরী হয়ে এসেছে তার আয়া নমিতারানি। মেয়ে সুতীর্থাও মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অধ্যাপিকা। তবে, তার বিষয় ভূগোল আর মায়ের ইতিহাস।

সীমার শাশুড়ি হরিমতী দেবী বাতের রোগী। প্রথম যখন সীমা চাকরিতে ঢোকে, হরিমতীর খুব একটা আন্তরিক সায় ছিল না। কিন্তু ননদ কেয়া মাকে আড়ালে বোঝাল— এখন তো মা কেউ লেখাপড়া শিখে বাড়িতে বসে থাকে না। তাছাড়া বউ সবসময় ঘুরঘুর করে পায়ে পায়ে জড়ালে মতান্তর, মনান্তরও তো হয়। তার চেয়ে এই তো ভালো।' হরিমতী দেবীরও যুক্তিটা মনে ধরেছিল।

পাঁচ বছরের মেয়ে সুতীর্থা কোনও দিন মায়ের অভাববোধ করেনি। হরিমতী তো ছিলেনই। আর ছিল পুষ্পলতা— সুতীর্থার পুষ্পাদি। পুষ্পলতা এ বাড়িতে কাজ করছে ২৬/২৭ বছর হয়ে গেল। খাওয়া পরার ভিত্তিতেই তার কাজ। সামান্য কিছু বেতন ব্যাঙ্কে জমে। পুষ্পলতা ছোট্ট সুতীর্থাকে তার গ্রাম আমতলার গল্প বলে। বালবিধবা, নিঃসন্তান পুষ্পলতার নিজের বলতে আছে দেওরের ছেলেরা। তাদের মা অসুস্থ ছিল বলে পুষ্পলতাই তাদের মানুষ করেছিল। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে উঠে কলতকাতার অনেক বাবুরা গ্রামের বাড়ি আমতলায় যায়। সুতীর্থা অবাক হয়ে বলে— 'পুষ্পাদি, আমাকেও তোমার বাড়ি নিয়ে চল না।' পুষ্পলতা বলে— 'তুমি আরেকটু সেয়ানা হও। তখন তোমায় নে যাব।'

ধীরে ধীরে সুতীর্থা বড়ো হলো। এম.এ. পাশ করল। আইনজ্ঞ সুদীপের সঙ্গে ওর বিয়ে হলো। বিয়ের পর নতুন জামাই আসার দিন পুষ্পলতা হরেকরকম রান্না করে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল জামাই ও তাঁর পরিজনদের।

ছন্দপতন কিন্তু ঘটল এক সময়। ইতিমধ্যে হরিমতী দেবী মারা গেছেন। সুতীর্থা বাপের বাড়ি এসে যথাসময় কলেজে বেরিয়ে যায়। সুরঞ্জন কর্মস্থলে, সীমাও অধ্যাপনার কাজে। বাড়িতে শুধু পুষ্পলতা আর নমিতারানি— ছোট্ট রুম্পাকে দেখাশোনা করার আয়ামাসি। এ সংসারে পুষ্পলতার জনপ্রিয়তা নমিতার সহ্য হয় না। সে সীমার কাছে অভিযোগ করে— পুষ্পলতা তাকে ভাত কম দেয়। সীমা বিরক্ত হয়ে পুষ্পকে বলে— 'ওকে তো আর একটু ভাত বেশি দিলেই পারো। ও যদি কুটুমবাড়িতে গিয়ে নিন্দে করে তাহলে তো আমাদেরই লজ্জা।' পুষ্প অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ওই পরিমাণ ভাতও নমিতার কম হয়? তাকে তো কোনওদিন সেকথা বলেনি। তাহলে তো পুষ্প সানন্দে তাকে আরও বেশি কিছু ভাত দিয়ে দিতে পারত— নিজের কিছুটা কম হলেও। পুষ্প মনে মনে আহত হয়। তবু মুখ ফুটে বলতে পারে না 'কাল থেকে তাহলে তুমিই ওর ভাতটা বেড়ে দিও বউদি।'

নমিতার কূটকাচালি ক্রমেই বেড়ে চলে। সে ইনিয়ে বিনিয়ে সীমার কাছে পুষ্পর নামে নালিশ করে সীমা বিরক্ত হয়ে পুষ্পকে বলে— 'একটু না হয় বনিবনা করে মানিয়ে-গুনিয়েই রইলে ওর সঙ্গে। পুষ্পর চোখে পড়ে, ফিক করে হেসে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে, সরে গেল নমিতা। পুষ্পর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল একদিন। সে বলল— 'আমি তবে যাই বউদি। আমার জন্যিই তো এত গোলমাল।' সীমা এতটা ভাবেনি। সামলে নিয়ে সে বলল— 'তোমাকে যেতে তো কেউ বলেনি। বলেছি, নমিতা যে কটা দিন থাকবে, ওর সঙ্গে একটু রফা করে, সমঝোতা ধরে থাকতে।' 'না গো বউদি। আবার কী ভুলচুক হই যাবে।' সে গড় হয়ে হরিমতীর ছবিতে প্রণাম করল। তারপর মা মেয়ের হতভম্ব মুখের সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

ব্যাঙ্কে গিয়ে তার যৎকিঞ্চিৎ টাকা নিয়ে সে দেওরের ছেলেদের জন্য কিছু কিছু জিনিস কিনল। তারপর ট্রেনে চেপে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো।

ওকে দেখতে পেয়ে দেওরের ছেলেরা অবাক।

'জেঠি, তুমি? এমন হঠাৎ করে?' 'ছেলেদের কাছে কি মাকে আগাম জানিয়ে আসতে হয় বাবা?' দেওরের ছেলে রামদাস সব শুনে বলল— 'বেশ করেছ। তোমায় আমরা 'মাতা'য় করি রাখব। তুমি যে আমাদের মায়ের অধিক।'

কিছুদিন যেতে না যেতেই পুষ্পর কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বারোটা বাজলে দাদাবাবুর গাড়ির হর্ন পেলে রুটির আটা মাখতে বসা মনে পড়ে। মনে পড়ে, ছোট্ট রুম্পার কথা। পুষ্প বিশ্বাস করত হরিমতিই সুতীর্থার কোলে এসেছেন।

কয়েকদিন পর রায়বাড়ির ড্রাইভার এসে হাজির। পুষ্পাদি, তুমি চল। ও বাড়িতে খুব গোলমাল। বউদি বলছে— 'এই বয়সে এইসব কাজ কি আমার পোষায়?'

পাখি, কুকুরের যত্ন হচ্ছে না। পুষ্পাদি, তুমি চল।' রেগে উঠল রামদাস— 'না জেঠি। তুমি যাবে না। লোকের কানভাঙানি কথায় যারা বিশ্বাস করে, তারাই আবার গাড্ডায় পড়লে ডেকে পাঠায়।' পুষ্প ধীরে ধীরে বলে— 'অনেকদিন যে গিন্নিমায়ের নুন খেইচি বাবা। ওদের অসময়ে কি আমি না গিয়ে পারি? আর এখনও হাত পা আছে। বসে গেলে যে একেবারেই বসে যাব বাবা।' পুষ্প শাড়িটা গাছকোমর বেঁধে উঠল গিয়ে ড্রাইভারের গাড়িতে। বিড়বিড় করে রামদাস বলল— 'নিজের ভালো পাগলেও বোঝে। এ কেমন মনিষ্যি জানিনে বাপু।' আর একালের এক বিরল প্রজাতির প্রতীক পুষ্পলতা অধীর আগ্রহে চলেছে কতক্ষণে সে তার চিরপরিচিত রায়বাড়ির রান্নাঘরের হাতা, বেড়ি, খুন্তি, কড়ার সঙ্গে তার প্রতিদিনের জীবনকে নতুন করে আবার মিলিয়ে নেবে। ■

একই বৃন্তে চারটি কুসুম

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

স্বামীজী বলছেন, ‘‘গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে।’’ —‘‘You will understand the Gita better with your biceps, your muscles, a little stronger.’’ বলছেন, ‘‘আমি এমন মানুষ চাই যাদের মাংসপেশী লোহা দিয়ে তৈরি, স্নায়ুগুলি ইস্পাত দিয়ে তৈরি আর এই দেহের মধ্যে এমন মন থাকবে যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।’’ তিনি মনে করতেন দুর্বলতাই পাপ। শুভঙ্করী কাজে শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। জগতের কল্যাণের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য শক্তির প্রয়োগই হচ্ছে ধর্ম। স্বামীজী মনে করতেন শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের এক তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা যে একসঙ্গে মিলতে পারি না, পরস্পরকে ভালোবাসি না, তোতাপাখির মতো কথা বলে যাই, আচরণে পশ্চাৎপদতা দেখাই— তার আসল কারণ হলো আমরা শারীরিকভাবে দুর্বল। বেদের প্রার্থনায় তাই বলের উপাসনা, সামর্থ্যের উপাসনা, শক্তির উপাসনার কথা পাই— ‘‘তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽসিত্তাজা ময়ি ধেহি।’’ হে তেজস্বরূপ, আমায় তেজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ, আমায় বীর্যবান কর; হে বলস্বরূপ, আমায় বলবান কর; হে ওজঃস্বরূপ, আমায় ওজস্বী কর। ঋগ্বেদ সংহিতা উদ্ধৃত করে বলছেন একচিত্ত হওয়াই সমাজ গঠনের রহস্য। ‘‘সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।’’

হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয় ও স্বামীজী :

স্বামী বিবেকানন্দ বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ, গুরুগোবিন্দ সিংহের মতবাদের জায়গা হিন্দুধর্মে আছে বলে মনে করতেন। ১৮৯৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্ম মহাসভার যোড়শতম দিনের অধিবেশনে তিনি বললেন, ‘‘Hinduism cannot live without Buddhism, nor Buddhism without Hinduism...the Buddhists cannot stand without the brain and philosophy of the Brahmins, nor the Brahmin without the heart of the Buddhist. This separation between the Buddhists and the Brahmins is the cause of the downfall of India.’’ বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচতে পারে না। হিন্দুধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধধর্মও বাঁচতে পারে না। ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনের সাহায্য না নিয়ে বৌদ্ধরা দাঁড়াতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যের এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। তিনি তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ‘‘Let us then join the wonderful intellect of the Brahmin with the heart, the noble soul, the wonderful humanising power of the Great Master.’’ তাই তিনি ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকা প্রকাশে উদ্যত হয়েছিলেন ব্রাহ্মণের অভিনব ধীশক্তির সঙ্গে লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান আত্মা ও অসাধারণ লোককল্যাণশক্তি যোগ করতে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের হিন্দুধর্মের সঙ্গে একই ছায়ার নীচে আনতে চেয়েছিলেন। ‘প্রবুদ্ধ’ কথাটির মধ্যে রয়েছেন হিন্দুদের দশাবতারের অন্যতম শেষ অবতার বুদ্ধ (প্র+বুদ্ধ=প্রবুদ্ধ)। তিনি মনে করতেন গৌতমবুদ্ধের সঙ্গে ভারত জুড়লে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন ঘটবে। ‘‘I repeat, Shakya Muni came not to destroy, but he was the fulfilment, the logical conclusion, the logical developmet of the religion of the Hindus.’’ হিন্দুদের মনে কোনো আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদের আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে ‘প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি’ শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত কবিতাটি—

‘‘আবার প্রবুদ্ধ হও।
এ নিদ্রা, মৃত্যুতে নয়, জীবনেই ফিরাতে আবার,
এ শুধু বিশ্রাম, যাতে চোখে ভাসে নতুন স্বপ্নের
অদম্য সাহস। দেখো, হে সত্য, পৃথিবী চায় তোমাকেই,
তুমি মৃত্যুহীন।’’

স্বামী বিবেকানন্দ ও শিখধর্ম :

১৯০৩ সালের গ্রীষ্মকাল, মেদিনীপুর পৌঁছেছেন ভগিনী নিবেদিতা। দেশপ্রেমী যুবকেরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘হিপ্ হিপ্ হুররে’। ‘না, না’, বারণ করে উঠলেন নিবেদিতা। ‘এটা ইংরেজ জাতির বিজয়োল্লাস, ভারতীয়দের তা কিছুতেই ব্যবহার করা উচিত নয়, কখনই নয়।’ হাত তুলে তিনি উচ্চৈস্বরে তিনবার বললেন— ‘ওয়া গুরুজীকি ফতে। বোল্ বাবুজীকি খালসা।’ গুরু’র জয়, গুরুদেবের জয়, তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন, তারই কৃপায় রক্ষা পেয়েছি। একদা এই ধ্বনি বীরত্বের লীলাভূমি পঞ্জাবে বীরেন্দ্র দেশপ্রেমিক শিখেরা দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করে উচ্চারণ করত মোগল শিখের রণে।

দক্ষিণেশ্বরে নানকপন্থী সাধুরা আসতেন শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনায় অংশ নিতেন। ১৮৮৩ সালের ২১ ডিসেম্বর, দিন উল্লেখ করে কথামৃতে রয়েছে, ‘‘অপরাহ্নে নানকপন্থী সাধু আসিয়াছেন। হরিশ, রাখালও আছেন। সাধু নিরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহাকে সাকারও চিন্তা করিতে বলিতেছেন।’’ (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত,

প্রথম খণ্ড)। অনেকসময় পঞ্চবটীর তলায় এসে বসে থাকতেন নানকপন্থী সাধুরা। ঠাকুরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল তাদের, যোগাযোগ ছিল চানক বা বর্তমান বারাকপুর পল্টনের সিপাই কুঁয়ার সিংহের সঙ্গে। তিনি ঠাকুরকে 'নানক' জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। কারণ ঠাকুরের মধ্যে তো ধর্মের সকল ধারার, সকল পন্থার বিকাশ! চানকের শিখ ও অন্যান্য সিপাইদের ঠাকুর আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েছেন, অভ্যাস যোগ করতে বলেছেন। এইভাবেই হিন্দু-শিখ ধর্মকে কাছাকাছি এনে ফেলছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এবার ঠাকুরের শিষ্য স্বামীজীর উপর বর্তালো হিন্দু-শিখ সমন্বয়- নদীতে জোয়ার আনতে। 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি' বিষয়ে লাহোরে ধ্যান সিংহের হাবেলিতে শিকাগো বিজয়ের পর ১৮৯৭ সালে বক্তৃতা দিলেন স্বামীজী (দ্রষ্টব্য : বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, অখণ্ড বাংলা সংস্করণ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৭৭০-৭৭৬)। বললেন, ''এখানেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে দয়াল নানক তাঁর অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁর প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বার খুলে এবং বাহু প্রসারিত করে সমগ্র জগৎকে— শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানদেরও পর্যন্ত আলিঙ্গন করতে ছুটে গিয়েছিলেন। এখানেই আমাদের জাতির শেষ এবং মহামহিমান্বিত বীরগণের অন্যতম গুরু গোবিন্দ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন।... আমাদের মধ্যে কী কী বিভিন্নতা আছে তা প্রকাশ করবার জন্যে আমি এখানে আসিনি। এসেছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় তাই অন্বেষণ করতে। কোন ভিত্তি অবলম্বন করে আমরা চিরকাল সৌভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারি। কোন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে যে বাণী অনন্তকাল ধরে আমাদের আশার কথা শুনিয়ে আসছে, তা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে পারে, তা বোঝার চেষ্টা করতে আমি এখানে এসেছি।" দেখা যাচ্ছে বহুধা বিদীর্ণ ধর্মীয় মতবাদের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনে অনন্য প্রয়াস-সাধনে হাত দিয়েছেন বীর সন্ন্যাসী। শিখ গুরুর মতোই তিনি বীর।

স্বামীজী বলেছিলেন, ''বর্বর জাতির আক্রমণ-তরঙ্গ বারবার আমাদের এই জাতির মস্তিষ্কের ওপর দিয়ে চলে গেছে। শত শত বছর ধরে ধরে 'আল্লা হো আকবর' রবে ভারতের আকাশ মুখরিত হয়েছে। আর সেই সময় এমন কোনো হিন্দু ছিল না যে প্রতি মুহূর্তে নিজের বিনাশের আশঙ্কা করেনি।" (লাহোরে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতা, বিষয় : হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি, তথ্যসূত্র : ঐ, পৃ. ৭৭১)। শিখপন্থার মানুষের কাছে স্বামীজীর বার্তা ছিল, ''যদি পারি তাহলে আমাদের পরস্পরের মিলনভূমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করব। এবং যদি ঈশ্বরের কৃপায় এ সম্ভব হয় তাহলে ওই তত্ত্ব কাজে পরিণত করতে হবে।"

ধর্ম ভারতবর্ষের আত্মা :

স্বামীজী রাষ্ট্রের আত্মার কথা বলেছেন। বলেছেন এই আত্মাতে যতদিন না ঘা পড়ে, ততদিন সেই রাষ্ট্রের মৃত্যু নেই। স্বামীজী উদাহরণ দিচ্ছেন রাষ্ট্রের আত্মা বা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয়ত্ব যেন সাপের মাথার মণি, যেন রূপকথার জগতে রাক্ষসীর প্রাণভোমরা-রূপ ক্ষুদ্র পাখির ভিতর তার প্রাণ ততক্ষণ তাকে মারা যাবে না। সাপ বা রাক্ষসীকে মারতে হলে মাথার মণি সরাতে হবে, সেই প্রাণপাখিকে টুকরো করে কেটে ফেলতে হবে। স্বামীজী বলছেন, ভারতবর্ষের যে রাষ্ট্রীয় সৌধ, ভারত রাষ্ট্রের যে মেরুদণ্ড তার আত্মা রয়েছে ধর্মে। ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবন নিহিত আছে হিন্দুধর্মে। তিনি ভারত রাষ্ট্রের মন ও প্রাণপ্রবাহের স্বরূপ চিহ্নিত করেছিলেন। বলেছিলেন ধর্ম অনুসরণ করলেই দেশ গৌরবান্বিত হবে। ধর্ম পরিত্যাগ করলে রাষ্ট্রীয় মৃত্যু অনিবার্য। বৈদেশিক আগ্রাসনকারীর অত্যাচারে মন্দিরের পর মন্দির ধ্বংস হয়েছে, নেমে এসেছে নানাবিধ আক্রমণ, ধ্বংসলীলা। কিন্তু অত্যাচারের স্রোত সামান্য বন্ধ হওয়ামাত্র পুনরায় উঁকি মেরেছে মন্দিরের চূড়া, স্পষ্টতর হয়েছে পুনরাভ্যুত্থানের চিহ্ন। ধ্বংসাবশেষ থেকে উত্থিত হয়েছে নতুন জীবন, সে জীবন অটল-অচল ভাবে বিরাজ করেছে আগের মতোই।

রাক্ষসীর প্রাণ-পাখির মতো ভারতবর্ষের ধর্ম-রূপ প্রাণ-পাখিকে বিনাশ করা যায়নি বলেই এত সয়ে এ জাতটা বেঁচে গেল। হাজার হাজার বছরের স্বভাব— তা মরবেই বা কী করে? স্বামীজী ভারতবর্ষের এই জাতীয় চরিত্র বদলের কথা বলেননি। তাঁর মতে যে নদী পাহাড় থেকে হাজার ক্রোশ নেমে আসে তাকে ফের পাহাড়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। বলছেন, যদি এ দশ হাজার বছরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই তো নয়। বলছেন, যে দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম সে দেশকে ধর্মের মধ্য দিয়েই সব করতে হবে। ''রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামিচিই সার...।'' ভারতবর্ষের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়ে ছাড়া কাজ করবার যে অন্য উপায় নেই তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বামীজী জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সতর্ক করে তিনি বলেছেন ধর্ম ছেড়ে জড়বাদসর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হলে ভারতবর্ষের সুবিশাল রাষ্ট্রীয় সৌধ তিনপুরুষ যেতে না যেতেই বিনষ্ট হবে, হিন্দুর মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে।

এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর পরামর্শ হলো, যে অমূল্য ধর্মসম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি তা প্রাণপণে ধরে রাখতে হবে। এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। বলেছেন, তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। তিনি একহাতে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধরে অন্য হাত প্রসারিত করতে বলেছেন শেখবার জন্য, বলেছেন সেই শিক্ষণীয় বিষয় যেন হিন্দুজীবনের মূল আদর্শের অনুগত হয়। ''What we want are western science coupled with Vedanta and Brahmacharya as the guiding motto." এটিই হচ্ছে নতুন যুগের বিশ্বায়নের মূলমন্ত্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের সমন্বয়, যার মূলে থাকবে ব্রহ্মচর্য।

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ— বিশ্বের এই চারটি ধর্মের উৎসভূমি ভারতবর্ষ। আলাদা ধর্ম বলা হলেও তা যে আদতে একই ধর্মের কুসুমোদ্যানে প্রস্ফুটিত পৃথক ফুল— সেই শাশ্বত সত্যটি প্রকাশ করাই বর্তমান ভারতে একান্তভাবে জরুরি হয়ে পড়েছে। ■

সৎ কাঠুরিয়া

এক গ্রামে মঙ্গল নামে এক কাঠুরিয়া বাস করত। সে খুব গরিব হলেও খুব সৎ ছিল। সারাদিন বনে বনে ঘুরে শুকনো কাঠ কেটে সেগুলি সন্ধ্যেবেলা বাজারে বিক্রি করে যা পেত তাই দিয়ে চাল, ডাল, নুন কিনে এনে সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন করত। তাতেই সে খুব আনন্দে থাকত।

প্রতি দিনের মতো সেদিনও সে অন্য জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে নদীর ধারের একটা গাছে শুকনো ডাল দেখে তাতেই চড়ে বসল। ডালটা খুব শক্ত ছিল। প্রথম ঘা মারতেই কুড়ুলটা তার হাত ফসকে নদীর জলে পড়ে গেল। মঙ্গল গাছ থেকে নেমে এসে নদীতে নেমে ডুব দিয়ে কুড়ুলটা খুঁজতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই সেটা খুঁজে পেল না। তখন মনের দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে নদীর পাড়ে বসে কাঁদতে লাগল। অন্য একটা কুড়ুল কেনার সাধ্যও তার ছিল না। কুড়ুল ছাড়া সে কীভাবে নিজের ও পরিবারের অন্নসংস্থান করবে ভেবে জোরে জোরে কাঁদতে লাগল।

মঙ্গলের দুঃখ দেখে জলদেবীর খুব দয়া হলো। জলদেবী জল থেকে উঠে মঙ্গলকে বলল, তুমি এত কাঁদছ কেন? মঙ্গল হাত জোড় করে বলল, ঠাকুর আমার কুড়ুলটা নদীর জলে পড়ে গেছে। আজ আমি কী করে কাঠ কাটব আর ছেলে-মেয়েকে কী খাওয়াব এই ভাবনায় কাঁদছি।

জলদেবী বলল, তুমি কেঁদো না। আমি তোমার কুড়ুল খুঁজে দিচ্ছি। জলদেবী জলে ডুব দিয়ে একটা সোনার কুড়ুল তুলে নিয়ে এসে কাঠুরিয়াকে বলল এই নাও তোমার কুড়ুল। মঙ্গল ভালো করে দেখে বলল এটা আমার কুড়ুল নয়। আমি গরিব মানুষ, এত ভালো কুড়ুল কেনার সাধ্য আমার কোথায়? জলদেবী দ্বিতীয়বার ডুব দিয়ে আবার একটা রুপোর কুড়ুল তুলে এনে বলল এই নাও তোমার কুড়ুল। মঙ্গল বলল— বাবা, এটাও আমার নয়। আমি তো বললাম আমার কুড়ুল এত ভালো নয়। তুমি মিছি মিছি আমার জন্য কষ্ট করছ।

জলদেবী আবার ডুব দিলেন। এবার মঙ্গলের লোহার কুড়ুলটি তুলে আনলেন। মঙ্গল এবার খুব খুশি। জলদেবীকে সে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের কুড়ুলটি হাতে তুলে নিল। জলদেবী মঙ্গলের সততা দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আমি তোমার সততায় খুব খুশি হয়েছি। তোমাকে সোনা ও রুপোর কুড়ুল দুটিও দিলাম।

সোনা ও রুপোর কুড়ুল দুটি পেয়ে মঙ্গল বড়োলোক হয়ে গেল। তার প্রতিবেশী হরেন মঙ্গলকে তার বড়োলোক হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সরলমতি মঙ্গল সব ঘটনা বলে দিল। লোভী হরেন মনের লোভে পরের দিন নিজের কুড়ুল নিয়ে ওই বনেই নদীর ধারের ওই গাছেই উঠে কাঠ কাটতে কাটতে ইচ্ছে করেই তার কুড়ুলটি নদীতে ফেলে দিয়ে পাড়ে বসে কাঁদতে শুরু করল।

জলদেবী হরেনের কান্না শুনে জল থেকে উঠে হরেনকে কারণ জিজ্ঞাসা করে জলে ডুব দিয়ে একটি সোনার কুড়ুল তুলে এনে বললেন এটি তোমার? হরেন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমার। জলদেবী রেগে হরেনের দিকে তাকিয়ে কুড়ুলটি জলে ফেলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

লোভের বশে হরেন নিজের কুড়ুলটিও হারালো আর মনের দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরে এল।

—শম্ভুনাথ পাঠক

ভারতের পথে পথে

কুরুক্ষেত্র

হিন্দুদের সর্বপ্রাচীন ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র ক পবিত্র তীর্থ। কৌরব ও পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষ রাজর্ষি কুরু এখানে তপস্যা করেন। মহাভারতের ১৮দিন ব্যাপী ধর্মযুদ্ধ ঘটেছিল এই কুরুক্ষত্রেই। এখানেই জ্যোতিসরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতাজ্ঞান উদ্‌গত হয়েছে। সূর্যগ্রহণ ও ফাল্গুন মাসের শুক্লা একাদশীতে মেলা বসে। ওই সময় দ্বাপরের দ্বৈয়ায়ণ হ্রদ অর্থাৎ আজকের সূর্যকুড়ড তীর্থে স্নানের জন্য লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। কুরুক্ষেত্রের ১৩ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে ৩৬৫ টি তীর্থস্থান রয়েছে। এখানকার ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্রহ্মসরোবরের মাঝখানে সর্বেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। গীতা মন্দির আছে সরোবরের তীরে। রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ মিউজিয়াম। ব্রহ্মসরোবরের তীরে পাঁচ একর পরিসরে তৈরি হয়েছে ধর্মযুদ্ধের প্যানোরামিক দৃশ্য। রয়েছে বিজ্ঞানকেন্দ্র, ভীষ্মকুণ্ড, অভিমন্যুক্ষেত্র, কর্ণমন্দির, শঙ্করাচার্য মঠ ইত্যাদি।

জানো কি?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রাপ্ত গ্লোবাল পুরস্কার

- আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'Amir Abdullah Khan Award'.
- সৌদি আরবের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'Order of King Abdulaziz Shah '.
- প্যালেস্টানির সর্বোচ্চ সমমান 'Grand Coller of the State of Palastine'.
- দক্ষিণ কোরিয়া থেকে পেয়েছেন 'Seoul Peace Prize.

ভালো কথা

অন্য মাতৃত্ব

গুজরাটের আহমেদাবাদের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের শিক্ষিকা রুশিয়ানা মারফাতিয়া গত ২০ সেপ্টেম্বর পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। কয়েকদিন পরেই তিনি বুঝতে পারেন যে, যে পরিমাণ দুধ তাঁর শিশু পান করছে তার থেকে অনেক বেশি দুধ তাঁর বুকে তৈরি হচ্ছে। তখনই তিনি ঠিক করেন অতিরিক্ত দুধ দান করবেন। রুশিয়ানা তাঁর স্বামীকে সেকথা বলতেই তিনি 'মম'-এর কথা তাঁকে বলেন। 'মাদার ওন মিল্ক' ব্যাঙ্কের সংক্ষেপিত নাম 'মম'। সারা গুজরাটে এই সংস্থা প্রতিদিন ছশো সদ্যোজাত শিশুর আহার জোগাচ্ছে। জন্মের পরই যে শিশুরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে তাদের প্যাকেটজাত দুধ দেওয়া হয় না। তাদের জন্য প্রয়োজন হয় মাতৃদুগ্ধের। এরকম শিশুদের জন্য রুশিয়ানা গত তিন মাসে ১২ লিটার স্তন্যদুগ্ধ দান করেছেন। তাঁর দান করা দুধেই আইসিইউ-এ থাকা পাঁচজন শিশু এখনও বেঁচে আছে। তবে রুশিয়ানা একা নন, শিশু বাঁচানোর লড়াইতে নেমেছেন ২৫০ জন সত্যিকারের মা।

বৈশালী গোস্বামী, দ্বাদশ শ্রেণী, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নয়া দিল্লি,

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ল শি ব পে

(২) কি ফ ফি ন্দি

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) স স্য প হা রি হা

(২) ন্য মা শ সৈ স বে

১০ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) পাষাণপ্রতিম (২) পুরাণকহিনি

১০ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) হাজারদুয়ারী (২) হংসমালিকা

উত্তরদাতার নাম

(১) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (২) আলাপন দলই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর।
(৩) অকাশ বাসফোর, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। (৪) অর্ঘ্যকমল সাঁই, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

খেলার দুনিয়ার টুকরো খবর

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপলসে মারাদোনা মিউজিয়াম : ইতালির নেপলস ছবির মতো সুন্দর বন্দর শহর। এখানেই হলিউডের বহু বিখ্যাত 'গডফাদার' ছবির শ্যুটিং হয়েছিল যেহেতু এটা মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। আবার অন্যদিকে আধুনিক বিশ্ব ফুটবলের 'গডফাদার' দিয়েগো মারাদোনার যৌবনের লীলাক্ষেত্রও বটে। বহু মরসুম নেপলসে খেলেছেন মারাদোনা। নেপলস ইতালির তলার দিকে ক্লাব থেকে তার নেতৃত্বে ইউরোপের সেরা ক্লাবের তকমা অর্জন করছে। তাই স্বদেশের মতো ইতালির নেপলসেও মারাদোনার মর্যাদা প্রায় ভগবানের মতো। নেপলসের 'প্রেটল সেন্ট' হিসেবে অভিহিত তিনি। নেপলসের মেয়র ও অসংখ্য মারাদোনা ভক্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে মারাদোনা মিউজিয়াম। কী নেই সেখানে। ১৯৮৬-এর বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে মারাদোনার ব্যবহৃত বুট জোড়া স্থান পেয়েছে। শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচের জার্সি ও জেয়ার ব্যান্ডও ঢুকে পড়েছে নেপলসের সংগ্রহশালায়। নেপলসে যে ফ্লাটে থাকতেন সেই ফ্লাটের সোফা কাম বেড, ক্লাবের সঙ্গে করা চুক্তিপত্রের খসড়া, ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা অসংখ্য স্মারক এখানে স্থান পেয়েছে। দেশ-বিদেশের অগণিত পর্যটক প্রতিদিন নেপলসে বেড়াতে আসছেন শুধুমাত্র সমুদ্র উপকূলের শোভা উপভোগ করতে নয়, তাদের জীবনকালে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট দুনিয়ায় রীতিমতো হিরোর মর্যাদায় পূজিত মানুষটির নামাঙ্কিত মিউজিয়াম দর্শন করতেও, যা তাদের রীতিমতো নস্টালজিক করে তুলবে।

এসপালা সাইক্লিংয়ের নতুন রুট : ভুয়েলটা ডি এসপালার সংগঠকরা চলতি বছরে স্প্যানিশ ক্রস কান্ট্রি সাইক্লিংয়ের জন্য একটি নতুন রুট বের করেছেন। নেদারল্যান্ড থেকে ফ্রান্স, পর্তুগাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই দীর্ঘ ৩২৪৫ কিমি যাত্রাপথে ২১টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে এই র‍্যালিকে। তবে বেশিরভাগ পথ ও পর্ব পড়েছে স্পেনে। ১৪ আগস্ট নেদারল্যান্ডের উট্রেথট থেকে সাইক্লিস্টরা যাত্রা শুরু করবেন। গোটা দুনিয়ার সেরা লংডিসটান্স সাইক্লিস্টরা এতে অংশগ্রহণ করবেন। তার আগে গোটা জুলাই মাস ধরে চলবে দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রসকান্ট্রি সাইক্লিং র‍্যালি ট্যুর দ্য ফ্রান্স। এই ইভেন্টের পরপরই স্প্যানিশ ক্রসকান্ট্রি মিট যা বিশ্বের সাইক্লিং প্রেমী মানুষকে দুমাস ধরে মাতিয়ে রাখবে। সংগঠকরা আশা করছেন স্পেনের পাশাপাশি ফ্রান্স, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডেও এই র‍্যালিকে ঘিরে তৈরি হবে রোমাঞ্চকর উন্মাদনার আবহ।

কাতারে স্বাগত সমকামীরা : ২০২২-এর বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশ কাতারে। আর বিশ্বকাপ দেখার জন্য পুরুষ ও মহিলা সমকামীদের জন্য দরজা খুলে রাখার কথা ঘোষণা করেছে কাতারের সংগঠকরা। এজন্য তারা ফিফা থেকে অনুমতিও পেয়ে গেছে। সাধারণত ফিফা তার নিজস্ব সনদে সমকামী, প্রতিবন্ধী, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্তদের আমন্ত্রণ জানায়, সব টুর্নামেন্টে এদের জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থাও করা হয়। সম্প্রতি তাদের প্রিয় ক্লাবকে সমর্থন করতে ২০২৩ বিশ্বকাপের এক প্রভাবশালী সংগঠক কর্তা ক্লাব বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ডে গিয়ে সেখানকার সমকামী সংগঠনের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে তাদের আসা নিশ্চিত করেন। ক্লাব বিশ্বকাপে এই সব সমর্থকরা মাঠে আসায় কাতারের সংগঠকদের ধারণা পরবর্তী বিশ্বকাপে বিভিন্ন দেশের সমকামী সমর্থকরা মাঠে আসবেন নিজের নিজের দেশকে সমর্থন করতে।

পদক কাড়া হলো ইউক্রেন ভারোত্তলকের : ২০১২-র অলিম্পিক মিটে সোনাজয়ী ইউক্রেনিয়ান ভারোত্তলক ওলেক্সি টবোকাটিভের পদক কেড়ে নেওয়া হলো ডোপিংয়ে অভিযুক্ত প্রমাণিত হওয়ায়। বিশ্বসংস্থা সম্প্রতি ওয়াডার যে রিপোর্ট হাতে পেয়েছে তাতে দেখা গেছে ওলেক্সির মূত্রে নিষিদ্ধ ড্রাগের সন্ধান পাওয়া গেছে। ৩৩ বছরের এই ভাবোত্তলক সুপার হেভিওয়েট ক্যাটাগরিতে বিশ্ব সেরা হয়েছেন ডোপিংয়ের সাহায্য নিয়ে এমনটাই অভিমত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের। এর আগে তিনি একই অভিযোগে দু'বছর সাসপেন্ড ছিলেন। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ইউক্রেন খেলা ও শরীরচর্চার বৃত্তে এক বড়ো শক্তি। তবে সম্প্রতি রাশিয়া ডোপিংয়ের অভিযোগে কলঙ্কিত হয়েছে। তার থেকে অন্যরকম কিছু ভাবতে পারছেন না রাশিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ ইউক্রেনের সংগঠকরাও। মূলত শারীরিক শক্তি নির্ভর শরীরবৃত্তীয় খেলাগুলিতেই রাশিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়া, বেলারুশের খেলোয়াড় ও অ্যাথলিটরা ডোপিং করে থাকেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যন্ত্রের মদতে। ■

আগুন পোহাচ্ছেন দিদি

শীত শেষ হতে চলল কিন্তু আগুন পোহানো শেষ হলো না দিদিমণির। তিনি এখনও রাজ্যে আগুন জ্বেলে রেখেছেন। তিনি ভালোই জানেন যে এই আগুন জ্বালিয়ে রাখা দরকার। তা না হলে যে তিনি শীতে কাবু হয়ে যাবেন। তাই নাগরিকত্ব আইন নিয়ে দিনের পর দিন আগুন পোহাচ্ছেন। পাশে রাজ্যবাসী না থাকলেও জোর করে বলে চলেছেন। কেন তিনি এমন করছেন তা বুদ্ধিমান পাঠক পাঠিকাদের বোঝানোর দরকার নেই। তবে এবার তিনি কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে।

এতদিন বিরোধী নেতারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতেন বিতর্কে বসার। মঙ্গলবার পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন শাহ। লখনউয়ের জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিরোধীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''ক্ষমতা থাকলে জনসমক্ষে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিতর্কে বসুন।''

শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবের নাম করেও চ্যালেঞ্জ ছোঁড়েন সদ্য প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি। জনসভায় শাহ হলেন, ''বিরোধীরা বাস্তবটা দেখতে পাচ্ছে না। কারণ ওদের চোখে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির চশমা লাগানো আছে।'' সারা দেশে এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন যতই তীব্র হোক তা থেকে পিছিয়ে আসার কোনও জায়গা নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন শাহ। তিনি বলেন, ''যে যতই আন্দোলন করুক, আমরা ভয় পাচ্ছি না। আর এই আইন প্রত্যাহারেরও কোনও প্রশ্ন নেই।''

শাহ বলেন, ''প্রতিদিন কংগ্রেস, তৃণমূল, এসপি, বিএসপি মিথ্যে কথা বলছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করছি, এই আইনে কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে না। এই আইন সে জন্য তৈরি হয়নি। এটা উদ্বাস্তু মানুষকে সম্মান দেওয়ার আইন।''

বিরোধীদের উদ্দেশে তীব্র আক্রমণ শানান শাহ। তিনি বলেন, ''দেশভাগের সময়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈনরা ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ এবং বাংলাদেশে ৩০ শতাংশ। আজ সেটা এসে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তানে ৩ শতাংশ আর বাংলাদেশে ৭ শতাংশ। যারা আজকে এই আইনের বিরোধিতা করছে তারা তখন কোথায় ছিল?''

এটা তো অমিত শাহের চ্যালেঞ্জ। আইনের চ্যালেঞ্জও আছে। কেন্দ্রের বানানো আইন যে রাজ্য মেনে নিতে বাধ্য সেটাও দিদিমণি ভালোই জানেন। তাই তো তিনি জঙ্গি আন্দোলনেই যেতে চাইছেন। কারণ, তাঁর জানা আছে যে, সোজা আঙুলে এই ঘি তিনি তুলতে পারবেন না।

কেমন করে তিনি আঙুল বাঁকাচ্ছেন সেটা একটা খবরের দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে ২৩ থেকে ২৫ জানুয়ারি এই তিন দিন এন্টালির রামলীলা ময়দানে গণ অবস্থান করতে চলেছে জমিয়তে উলেমা।

সংগঠনের তরফে সোমবার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে জানানো হয়েছে যে ওই গণ অবস্থানের পৌরোহিত্য করবেন মমতা মন্ত্রীসভার সদস্য মওলানা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তাছাড়া বিবৃতিতে এও বলা হয়েছে, ''জমিয়ত যেহেতু বরাবর শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করে আসছে, এই প্রতিবাদ কর্মসূচিও শান্তিপূর্ণ হবে।''

প্রমুখ প্রশ্ন হলো, হঠাৎ জমিয়ত তথা সিদ্দিকুল্লাকে কেন সিএএ-র বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার কথা বললেন তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব? আসলে নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের বিরোধিতায় তৃণমূলের আন্দোলন যে আপোশহীন সেই বার্তা দিতেই সিদ্দিকুল্লাকে আন্দোলনে বসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর একটা প্রেক্ষাপটও রয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কলকাতা সফরের সময় রাজভবনে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা নিয়ে সংখ্যালঘুদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। বাম ও কংগ্রেস সেই অসন্তোষে আরও অক্সিজেন দেওয়ার চেষ্টা করছে। এবং তার মাধ্যমে সংখ্যালঘু ভোটের বিভাজন ঘটাতে চাইছে। এখন তা ঠেকানোর জন্যই সক্রিয় হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুতরাং, সবেতেই দিদিমণির এক চিন্তা। সংখ্যালঘু ভোট। আর তাই তিনি আগুন পোহাতে ভালোবাসছেন।

কিন্তু কতদিন আগুনের জোর থাকবে কে জানে!

—সুন্দর মৌলিক

বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বাঙ্গালি হিন্দুদের আত্মত্যাগ

চন্দন রায়

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। প্রতি বছরই বিজয় দিবস হিসেবে দিনটি মহা সমারোহে পালিত হয়ে আসছে। এই দিনে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে ঢাকার সোরাবউদ্দিন ময়দানে (রেসকোর্স) আত্মসমর্পণ করে। ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এই দিনই স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় দিবস যা একটা দীর্ঘ ইতিহাস। এই ইতিহাস সৃষ্টির পিছনে রয়েছে তৎকালীন যেমন পূর্ববঙ্গের হিন্দুজনগোষ্ঠীর গৌরবের ইতিহাস তেমনই রয়েছে অপমান ও বঞ্চনার করুণ ইতিহাস, যে ইতিহাস বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায় আঁচড় কাটেনি। পূর্ব-পশ্চিমের কোনো বাংলা সাহিত্যে, নাটকে সিনেমায় এই ইতিহাস স্থান পায়নি। এপার-ওপার কোনো বাঙ্গলার রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে উঠে আসেনি। রাজনৈতিক সেমিনার সভাসমাবেশে আলোচনা বা চর্চার বিষয় হয়ে ওঠেনি, এমনকী চায়ের কাপেও ঝড় তোলেনি। এটাই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বঞ্চনা ও অবহেলার করুণ ইতিহাস। ৪৮তম বিজয় দিবস স্মরণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গালি হিন্দুদের বিস্মৃতপ্রায় অমূল্য আত্মত্যাগ ও অবদানের কিছু কথা তুলে ধরছি।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের তথা পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক দল বা নেতাদের পাকিস্তান শাসকদের পূর্ববঙ্গের প্রতি বিমাতৃ ও প্রভুসুলভ আচরণের জন্য পাকিস্তান প্রীতির মোহভঙ্গ ঘটে। তৎকালীন পাকিস্তান আন্দোলনের যুবনেতা কুখ্যাত সোরাবউদ্দিনের ভাবশিষ্য শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লিগ ত্যাগ করে আওয়ামি মুসলিম লিগ রাজনৈতিক দল তৈরি করেন এবং পাকিস্তানের শাসককুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। উর্দু নয়, বাংলা হবে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষা--- এই দাবিতে পাকিস্তানের সংসদে প্রথম প্রতিবাদে সোচ্চার হন পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য বাঙ্গালি হিন্দু নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ফলস্বরূপ, ১৯৫২ সালের বাঙ্গালির গর্ব রক্তক্ষয়ী ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। গ্রাম, শহর, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বাঙ্গালি সংস্কৃতি চর্চার তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পয়লা বৈশাখে বর্ষবরণ, শারদীয়া উৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ ও বসন্ত উৎসবের মতো বাঙ্গালি সংস্কৃতি চর্চা ও উৎসব দেশাত্মবোধক সংগীত,নাটক, যাত্রাপালা গ্রামগঞ্জের স্কুল কলেজগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে, যার পুরোভাগে ছিল হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাগত আধিক্যের কারণে সমস্ত বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল পথপ্রদর্শক ও অগ্রগণ্য। কারণ তৎকালীন মুসলমান সমাজে সংগীতচর্চা, গানবাজনা, নাটক, নৃত্যকলা চর্চা খুবই নগণ্য ছিল। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রভাবে শেখ মুজিব আওয়ামি লিগ থেকে 'মুসলমান' শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামি লিগ নামক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল হিসেবে অচিরেই ইসলামি পাকিস্তানের রাজনীতিতে আলোড়ন ও প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে পাকিস্তানি শাসককুল ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান জনগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালিদের উপর অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালিদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন অবজ্ঞা ও বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামি লিগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আপামর বাঙ্গালি ছাত্র যুব-সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ধারা ক্রমাগত সারা পূর্ববঙ্গ ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং এক বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে স্মারকবেদি গড়ে ওঠে। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদদিবস হিসেবে পালিত হতে থাকে। সেই উপলক্ষ্যে শহিদ বেদিগুলি ফুলে ফুলে ও বিভিন্ন রঙের আলপনায় সাজানো হয়। পাকিস্তান বিরোধী নাটক, কবিতা, সংগীতে ও পাকিস্তান বিরোধী স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত ও আন্দোলিত হয় যা হিন্দু বাঙ্গালি সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। ফলস্বরূপ ৫৮, ৬২, ৬৬ ও ৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রতি আন্দোলনের ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আন্দোলনকে বিপথগামী ও ভণ্ডুল করতে হিন্দুদের চক্রান্তকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে জেহাদি মুসলমানদের হিন্দুদের উপর হিংস্র বাঘের মতো লেলিয়ে দেয়। হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি লুট, অগ্নি সংযোগ, হিন্দু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কারারুদ্ধ করা, হত্যা করা, ব্যবসা বাণিজ্য এমনকী সরকারি চাকুরি সমূহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, শত্রু সম্পত্তি আইন করে হিন্দু বিষয় সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া এবং পূর্ববঙ্গ ছাড়তে বাধ্য করা পাকিস্তানি শাসককুলের প্রধান কাজ হয়ে যায়। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যত তীব্র হয় ততই হিন্দুদের উপর পাকিস্তানি শাসককের অত্যাচার ও নির্যাতন তীব্রতর হয়। হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর এই নির্যাতন নিপীড়ন, হিন্দু বিষয় সম্পত্তি লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনা সারাবিশ্বে পাকিস্তান শাসকদের বাঙ্গালিদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন হিসেবে বিবেচিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের গণভোটের দাবিতে গণ-অভ্যুত্থানের ফলস্বরূপ ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা

ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি। যার মধ্যে হিন্দুরা ছিল ২৭ শতাংশ। ভোট ছিল প্রায় তিন কোটি। ভোটদাতার সংখ্যা ছিল প্রায় দুই কোটি। ১০০ শতাংশ হিন্দু ভোট শেখ মুজিবের আওয়ামি লিগ দল পেয়েছিল। ফলে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামি লিগ পাকিস্তানের রাজনীতিতে ১৬০টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচনে জয়ী হতে সক্ষম হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমান ভোট বিভাজিত হয়ে পাকিস্তানপন্থী জামাত ইসলাম, মুসলিম লিগ পেয়েছিল প্রায় ৭০ লক্ষ ভোট। সুতরাং আওয়ামি লিগের পক্ষে ভোটদাতার অনুপাত ছিল হিন্দু মুসলমান ৫০ : ৫০। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঙ্গালি হিন্দু ভোট পাকিস্তানের রাজনীতিতে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী ক্ষমতায়নে ক্যাটালিস্ট হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খাঁ শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে। বাধ্য হয়ে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় বাংলাদেশের দাবিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেয় পরবর্তীতে যা স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ নেয়।

বাঙ্গালির স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে পাক শাসককুল সামরিক বাহিনী হিন্দু বাঙ্গালিদের উপর লেলিয়ে দেয়। শুরু করে অগ্নি সংযোগ ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা। এই গণহত্যায় রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, সমাজসেবী, ছাত্র-যুবা, শিশু-নারী-পুরুষ কোনো বাদ বিচার ছিল না। বাঙ্গালিদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভেদ তৈরি করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভারতের চক্রান্ত হিসেবে অপপ্রচার করে এবং কিছুটা সফল হয়। পাকিস্তানপন্থী জামাতও মুসলিম লিগের মতো ইসলামি দলগুলির বাংলাভাষী মুসলমান ছাত্র শিবির ও যুব সমাজ শহর ও গ্রামে রাজাকার, আলবদর ও আলসামের মতো সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে।

এই বাহিনীর কাজ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী ছাত্র যুবাদের খুঁজে বের করে নৃশংস ভাবে হত্যা করা, হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি লুটপাট, অগ্নি সংযোগ, হিন্দু নারী অপহরণ ও ধর্ষণ করা। তাই হিন্দুরা জীবন ও নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার তাগিদে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে থাকে। মাইলের পর মাইল দিনের পর দিন এক নাগাড়ে পায়ে হেঁটে কঠিন বিপদ সংকুল পথ অতিক্রম করে ভারতভূমিতে আশ্রয় নেয়। পালাবার পথে অসংখ্য প্রাণ হারিয়ে গেছে পাকসেনা এবং রাজাকারদের গুলির আঘাতে। রাজাকার বাহিনী হিন্দু যুবতী ও নারীদের কেড়ে নিয়েছে, হিন্দু যুবক, সমাজসেবী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে আর জীবন নিয়ে ফিরে আসেনি তারা। কোলের শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে পথে ফেলে পালিয়ে এসেছে পরিবারের আপনজনেরা। এই সবের কোনো ঘটনাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে জায়গা দেয়নি কেউ। তৎকালীন সাংবাদিকদের তোলা ফোটোচিত্রে অত্যাচারিত বাড়িঘর ছেড়ে পলায়নপর অসহায় পরিবারগুলির সত্য ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করলে সহজে বোঝা যায় তারা সবাই হিন্দু যারা নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। এই সব সত্য, জীবন্ত চিত্র ও ছবিগুলিকে হাতিয়ার করে অস্থায়ী বাংলাদেশের সরকার বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছিল এবং এই ছবিগুলির ভূমিকা ছিল অমূল্য।

এক কোটি নির্যাতিত ও বিতাড়িত হিন্দু শরণার্থী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আশ্রয় শিবিরগুলিতে দীর্ঘ ১০ মাস শোচনীয় অবস্থার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছিল। এই সমস্ত শরণার্থী ভারত সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠে। তারা ভারতের অর্থনীতির উপর চরম আঘাত হানে। ফলে ভারত সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করতে শরণার্থী শিবিরের দুর্বিসহ অসহনীয় চিত্র ও ছবিগুলি বিশ্ব দরবারে প্রচার করে যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি ভারতের যুদ্ধ এবং যুদ্ধে ভারতের জয় এবং বাংলাদেশের সাধের স্বাধীনতা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে অর্জন। ফলস্বরূপ পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায়—

• ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পাকিস্তান গণপরিষদে রাষ্ট্র ভাষা উর্দুর প্রতিবাদে এবং বাংলার দাবিতে গর্জে ওঠা যা বঙ্গ জাতীয়তাবাদের চেতনায় অঙ্কুরিত হয়েছিল।

• ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী প্রভাবিত বাঙ্গালি সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরবর্তীতে সকল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল।

• তৎকালীন পূর্ববঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাধিক্য থাকায় সকল আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। যার ফলে পাকসেনা ২৫ মার্চের কালরাত্রে ঢাকার হিন্দু ছাত্রাবাস জগন্নাথ হলের শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র হত্যা দিয়ে তাদের বাঙ্গালি হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল।

• পাকসেনা ও রাজাকার বাহিনীর হিন্দু নারী অপহরণ, হিন্দু ছাত্র যুবা হত্যা এবং হিন্দু সম্পত্তি লুটপাট অগ্নি সংযোগ যা পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন বিশ্বদরবারে প্রামাণ্য চিত্র হিসেবে প্রচারিত হয়েছিল।

• পূর্ববঙ্গ ত্যাগী পলায়নপর অসহায় এক কোটি হিন্দু শরণার্থী ও তাদের আশ্রয় শিবিরগুলির প্রামাণ্যচিত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

সর্বোপরি, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয় সহযোগিতায় অর্থ সাহায্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শরণার্থীদের আশ্রয়, এমনকী যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তাদের সহযোগিতা এবং অবদান কল্পনাতীত ও বিরল। বড়োই পরিতাপের বিষয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কারাবাস, আত্মত্যাগ, আত্মবলিদান ছিল আপোশহীন, অথচ তারা দেশ চ্যুত হলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ববাঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুরা পাকসেনা ও রাজাকার বাহিনীর নির্যাতন অত্যাচারে দেশত্যাগ করেও স্বাধীনতা আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে তরান্বিত করেছিল। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-উত্তর বাঙ্গালি হিন্দুরা বাংলাদেশচ্যুত হয়েছে এবং ক্রমশ হিন্দুশূন্য বাংলাদেশে পরিণত হতে চলেছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা রাষ্ট্রহীন জাতি হিসেবে বিশ্বদরবারে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ■

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে লেখা বই 'কর্মযোদ্ধা'র প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদীর ওপর লিখিত বই 'কর্মযোদ্ধা' প্রকাশ করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী হলেন একজন সংবেদনশীল ব্যক্তি, সুপ্রশাসক, যোগ্য নেতা, সমাজসেবক, যিনি সকলের কাছে এক অনন্য উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। এরপর সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। সবশেষে আদর্শ জাতি গঠনের লক্ষ্যে সংসদীয় গণতন্ত্র এবং ভারতের সংবিধান মেনে তাঁর পথ চলা। আজ প্রধানমন্ত্রী একজন আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত নেতায় পরিণত হয়েছেন। জাতির প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। নরেন্দ্র মোদীর জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর শৈশবে বিলাসিতার কোনো স্বাদ পাননি। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে সমাজের অবহেলার স্বীকার হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী জীবনে কারুর প্রতি তিনি বৈষম্যমূলক আচরণ করেননি। মোদীজী গুজরাটে বিজেপির সংকটের দিনে হাল ধরেছিলেন। তিনি নীতি মেনে সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলেন এবং জনগণের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে শ্রী মোদী যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন তার কথা উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং সামাজিক নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেরকম একটি পরিস্থিতি থেকে সমতা বজায় রেখে উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি 'গুজরাট মডেল' তৈরি করেন। গুজরাট থেকেই নতুন ভারতের 'সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস' ধারণাটির তিনি সূচনা করেন। বৈষম্যমূলক রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সুপ্রশাসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী 'জন সাম্যবাদ'-এর ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের জনগণ গুজরাটের উন্নয়নের মডেলকে স্বীকৃতি দিয়ে দেশের নেতৃত্বদানের জন্য মোদীজীকে নির্বাচিত করেছেন।

২০১৪ সালে মোদী সরকার যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল তখন ১২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি দুর্নীতি সরকারের মাথার ওপর ছিল। কিন্তু এই সরকারের বিরুদ্ধে এক পয়সারও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। এছাড়া, দেশের ৬০ কোটি দরিদ্র মানুষের জন্য সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৩ কোটি মানুষ রান্নার গ্যাসের সংযোগ পেয়েছে। ৯৯ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ পৌঁছেছে। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচিতে ৫০ কোটি মানুষকে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমার আওতায় নিয়ে আগা হয়েছে। অন্ত্যোদয় নীতির ওপর ভিত্তি করে মোদী সরকার ২০২২ সালের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য আবাসন এবং ২০২৪ সালের মধ্যে সকলের বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। শ্রী শাহ আরও বলেন, নেতা বনাম বাবু, গ্রামোন্নয়ন বনাম শহরোন্নয়ন এবং শিল্পোন্নয়ন বনাম কৃষি উন্নয়নের মতো প্রথাগত ধারণাকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে ভারতের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে মোদীজী বৈদেশিক নীতি এবং জাতীয় নীতি এবং জাতীয় নিরাপত্তা নীতিকে পৃথক করেছেন আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত আজ শক্তিশালী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশের ওপর যে কোনও আক্রমণকে আজ হাল্কা ভাবে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না। জম্মু-কাশ্মীরের জন্য ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা বাতিল, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন গ্রহণ করা, রামমন্দির সমস্যার সমাধান করা, তিন তালাক প্রথাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং বালাকোটে বিমান আক্রমণের মতো এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যা গত ৭০ বছরে কেউ ভাবতেই পারেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের পর মোদীজী ভারতের রাজনীতি থেকে জাতপাত, তোষণের রাজনীতি এবং সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিষয়গুলি নির্মূল করেছেন। ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি মাথায় না রেখে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে এই সরকার সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। নির্ভীকভাবে দেশ এবং জনগণের স্বার্থে শ্রী মোদী যেভাবে বিভিন্ন দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন, দেশ এর আগে কাউকে তা গ্রহণ করতে দেখেনি।

ইস্পাত ক্ষেত্রে ‘পূর্বোদয়’-এর সূচনা ধর্মেন্দ্র প্রধানের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ও ইস্পাত মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান কলকাতায় ‘পূর্বোদয়’-এর সূচনা করেছেন। সুসংহত ইস্পাত হাব গঠনের মধ্য দিয়ে পূর্ব ভারতের উন্নয়নে গতি আনতে ‘পূর্বোদয়’-এর সূচনা করা হয়েছে। শ্রী প্রধান বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনই হোক, বা সমাজ গঠন— সব ক্ষেত্রেই দেশকে নেতৃত্ব দেয় পূর্ব ভারত। পূর্ব ভারতের বহু সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সেই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় পূর্ব ভারত পিছিয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, ইস্পাত ক্ষেত্রে ‘পূর্বোদয়’ শুরুর মধ্য দিয়ে এক অধ্যায়ের সূচনা হলো। সুসংহত ইস্পাত হাব গঠনের সাহায্যে পূর্ব ভারতের উন্নয়নে গতি আসবে বলেও তিনি জানান।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব ভারতের উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে এমন বেশিরভাগ জেলাগুলিরই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ১০২ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে ন্যাশনাল ইনফ্রাস্টাকচার পাইপলাইন তৈরি করছে। পাইপলাইন, অভ্যন্তরীণ জলপথ, জাহাজ, সড়ক, বিমান ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিকাঠামোগত উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ জোর দিয়েছে। পূর্ব ভারতের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সরকার সব সময় গুরুত্ব দিয়ে এসেছে বলেও তিনি জানান।

শ্রী প্রধান বলেন, একুশ শতক প্রযুক্তি ও জ্ঞানের শতক। প্রযুক্তি দেশের অর্থনীতি এবং সমাজ গঠনে সাহায্য করে থাকে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল পূর্ব ভারত পাবে বলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, সহজে ব্যবসা করার সুবিধা দেশের বাণিজ্যিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রতীক। এক্ষেত্রে সরকার প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। কয়লা ক্ষেত্রে পণ্য পরিবহণের উন্নতি ও উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত এই সুসংহত ইস্পাত হাব পূর্ব ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিশারি বলেও তিনি জানান। ইস্পাত শিল্পের উন্নয়ন ঘটলে কর্মসংস্থানের বহু সুযোগ রয়েছে। এর সুফল পূর্ব ভারত-সহ সমগ্র দেশই পাবে বলে শ্রী প্রধান জানিয়েছেন।

ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের সংরক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণের বহুদিনের সমস্যা একবিংশ শতাব্দীর সমাধান নিতে প্রস্তুত ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া (এনডিএলআই)। উদ্যোগটি মানবসম্পদ উন্নয়নের মন্ত্রকের। রূপায়ণ করছে আইআইটি খড়্গপুর। সত্যজিৎ রায়ের নিজের হাতে লেখা চিত্রনাট্যের পাণ্ডুলিপি ‘খেরোর খাতা’র আসল ডিজিটাল কপি এনডিএলআই-তে সযত্নে সংরক্ষিত হচ্ছে। এটি এমনই একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে জানা যাবে দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাহিনি। যুগান্তর এবং অমৃতবাজার পত্রিকার ডিজিটাল কপি-ও পাওয়া যায় এনডিএলআই-তে যেখান থেকে আমরা পেতে পারি স্বাধীনতার আগে এবং পরের দেশের মূল্যবান ইতিহাস।

বেশ কিছু অমূল্য এবং প্রাচীন প্রকাশনা যেমন ১৯৩৪-এর প্রেসিডেন্সি রেজিস্টার যাতে আছে হিন্দু প্রেসিডেন্সির ১৮১৭ থেকে ঐতিহাসিক প্রতিবেদন, ছাত্রদের তালিকা এবং তাদের সম্বন্ধে তথ্য। এর অন্য কোনো প্রতিলিপি নেই। এটি প্রেসিডেন্সি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আছে। এই নথি, তথ্য, প্রতিবেদন এবং প্রবন্ধগুলি প্রেসিডেন্সি কলেজের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনে সহায়তায় ডিজিটাইজ করেছে ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া। ঐতিহ্যশালী একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জাতীয় জ্ঞান প্ল্যাটফর্মের এই একযোগে কাজ করাটা একটি প্রতীকস্বরূপ যা আমাদের কাছে ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাথেয়। বিনামূল্যে এইসব তথ্য, প্রতিবেদন, প্রবন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এনডিএলআই- এর ওয়েবসাইট— https://www.ndl.gov.in/ -এ। যে কোনো ব্যক্তি, যে কোনো স্থানে এর ব্যবহার করতে পারবেন। এনডিএলআই-তে নাম লেখানো যাবে বিনামূল্যে। অ্যান্ড্রয়েডের পাশাপাশি আইওএস অ্যাপেও এই প্ল্যাটফর্মটি পাওয়া যাবে।

রাজনীতির জন্য রাজনীতি নয়, রাষ্ট্রের বিকাশের জন্য এগোতে হবে আমাদের : অরুণ কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'জেএনইউ য়ের আন্দোলনের নেপথ্যে দেশকে খণ্ড খণ্ড করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। 'আইসা'-র মতো সংগঠনের এই স্বপ্নে ইন্ধন দিচ্ছে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। গত ছ'বছর ধরে এই শক্তি দেশে নানা অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে। বর্তমানে নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতার নামে দেশবিরোধী শক্তিকেই সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে।' রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচারপ্রমুখ তথা জম্মু-কাশ্মীর স্টাডি সেন্টারের অধিকর্তা অরুণ কুমার সম্প্রতি কলকাতায় ভারত বিকাশ পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় তাঁর ভাষণে বলেন, বিদেশি হানাদারদের ইতিহাস কোনও দেশের ইতিহাস হতে পারে না। মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও কাশ্মীর প্রসঙ্গে সেখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদী নানা দলের সঙ্গে এক সুরে কথা বলেছে কংগ্রেস। কাশ্মীরের ব্যাপারে স্বাধীনতা-উত্তর নানা সময়ের ঘটনা, শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা প্রভৃতির উল্লেখ করে এক দেশ, এক জাতি, এক সংবিধানের বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী

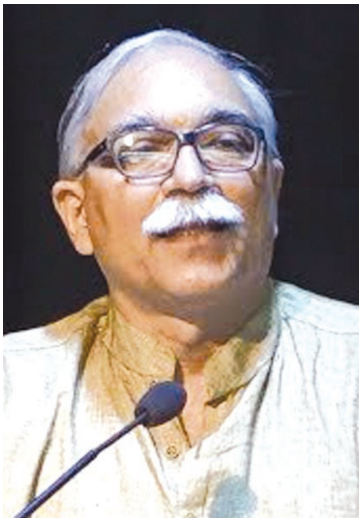

নরেন্দ্র মোদীর দৃঢ় মনোভাবের প্রশংসা করেন অরুণ কুমার।

কী পরিস্থিতিতে দেশভাগের সিদ্ধান্ত নিতে হলো, কীভাবে অসহায়ের মতো শরণার্থীরা ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন, কীভাবে অতীতে নানা সময় বিভিন্ন দল এঁদের রাজনীতির পাশা হিসেবে ব্যবহার করেছেন গত সাত দশক ধরে, তার বেশ কিছু উদাহরণ দেন অরুণ কুমার। এ প্রসঙ্গে ১৯৫০ সালের ৫ নভেম্বর বাবাসাহেব আম্বেদকরের খসড়া, জওহরলালের ভূমিকা, ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি, সংসদে দুই বাম নেতা ভূপেশ গুপ্ত ও প্রকাশ কারাতের বক্তব্য, ২০০৩-এ সংসদে মনমোহন সিংহের প্রস্তাব, ২০১০-এর ২৮ ডিসেম্বর মতুয়াদের সমাবেশে সিপিএম নেতা গৌতম দেবের আশ্বাস প্রভৃতির উল্লেখ করেন অরুণ কুমার। তিনি বলেন, ভৌগোলিক বিভাজনের পর যাঁরা নিজেদের এককালের মূল নিবাস ছেড়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের সম্পত্তির মূল্যায়নের দাবি উঠেছিল। কিন্তু তা হয়নি।

রামজন্মভূমি প্রসঙ্গে কেন্দ্রের শাসক দলের ভূমিকাকে ইতিবাচক মন্তব্য করেন অরুণ কুমার। তিনি বলেন, আমরা আত্মবিস্মৃত হয়েছি। আমরা কারা ভুলে গিয়েছি। এই ভারতের লক্ষ্য কী ছিল বাস্তবের ভেতর দিয়ে তা আমাদের জানতে হবে। এদেশের সনাতন আদর্শ বসুধৈব কুটুম্বকম্— ভোগ নয়, ত্যাগেই জীবন। হিন্দুশাস্ত্র আমাদের শিখিয়েছে এক দেশ, এক জাতি, এক সংস্কৃতি। এটা সব সময় মাথায় রাখতে হবে ভারতে অনেক রাজ্য, কিন্তু একটি দেশ। ভারতের প্রাণ হলো ধর্ম। আধ্যাত্মিকতা ভুলে যাওয়া মানে নিজেদের ভুলে যাওয়া। বিদেশে কোনও দিন উপনিবেশ তৈরির কথা ভাবেনি ভারত। এদেশ থেকে যাঁরা বিদেশে গিয়েছেন তাঁরা বরাবর গিয়েছেন সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে।

কাশ্মীর, সিএএ, এনআরসি প্রভৃতি নানা বিষয়ে গুলাম নবি আজাদ, পি চিদাম্বরম, অভিষেক মনু সিংভির সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অভিযোগ খণ্ডন করে অরুণকুমার উদাহরণ দেন কংগ্রেস কীভাবে বিভিন্ন সময় অসাংবিধানিক পথে হাঁটার চেষ্টা করেছে। এই সঙ্গে বলেন, রাজনীতির জন্য রাজনীতি নয়। সব মত, সব ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রের বিকাশের জন্য এগোতে হবে আমাদের।

জম্মু ও কাশ্মীরে ব্লক উন্নয়ন পরিষদগুলির নির্বাচন এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ : অনুরাগ ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় অর্থ তথা কর্পোরেট বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ সিংহ ঠাকুর বলেছেন, একাধিক ঐতিহাসিক ভুলের জন্য জম্মু ও কাশ্মীর বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনকী, এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে এখানকার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপরেও। জম্মু ও কাশ্মীরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচির রূপায়ণ সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের জন্য বিশেষ গণজ্ঞাপন কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে আজ জম্মুর নাগরোটাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সূচনা করে শ্রী ঠাকুর একথা বলেন। এক বিশাল জনসভায় শ্রী ঠাকুর বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে ব্লক উন্নয়ন পরিষদগুলির নির্বাচন এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপের ফলে স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলি নীতি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ হয়ে উঠেছে। বিগত ৭২ বছর স্বশাসিত সংস্থাগুলি এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের অভিন্ন অঙ্গ হয়ে উঠতে তৃণমূল স্তরে অংশগ্রহণের ওপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে, যাতে সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতায়ন ঘটানো যায়। ব্লক উন্নয়ন পরিষদের সদস্যদের কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট মৌলিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়ণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বহু দশক ধরে পরিষদগুলিকে তাদের ভূমিকা বাস্তবায়িত করা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহের দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বন্দুকের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতকে সমরাস্ত্র উৎপাদন হাব এবং অগ্রণী প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের সংকল্পের কথা পুনরায় জানিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ প্রতিরক্ষা উৎপাদনে আরও বেশি বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। শ্রী সিংহ গুজরাটের হাজিরাতে অগ্রণী বেসরকারি সংস্থা লার্সেন অ্যান্ড টুব্রোর সমরাস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রে ৫১তম কে-৯ বজ্র-টি বন্দুকের উদ্বোধন করে প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে বেসরকারি শিল্পের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে বলেন, ভারতকে বিশ্বের অগ্রণী প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে এখনও অনেক করণীয় হয়েছে।

''আমাদের সরকার নতুন ধ্যান-ধারণা গ্রহণে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি শিল্প সংস্থার উৎসাহ ও আগ্রহকে কাজে লাগাতে অঙ্গীকারবদ্ধ'' বলে জানিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মীকরণ এবং আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার লক্ষ্য অর্জনে যাবতীয় বাধা-বিপত্তি দূর করে একযোগে কাজ করার আশ্বাস দেন। শ্রী সিংহ আরও বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতকে ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিরক্ষা শিল্পে পরিণত করতে সরকার 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির আওতায় একগুচ্ছ সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র ধার্য লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছলে ২০ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ''আমরা এমন এক বাতাবরণ গড়ে তুলতে চাই যা রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ক্ষেত্রকে একযোগে কাজ করতে উপযুক্ত মঞ্চ প্রদান করবে এবং উভয় পক্ষের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দেশ গঠনে অবদান রাখা যাবে।''

অগ্রণী বেসরকারি সংস্থা লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো-র সমরাস্ত্র নির্মাণ কেন্দ্র ঘুরে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, এটি 'নয়ী ভারত কি নয়ী সোচ' মন্ত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির আওতায় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণ ও দেশজকরণের যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন, তা ধীরে ধীরে সঠিক রূপ নিতে চলেছে। অত্যাধুনিক কে-৯ বজ্র-টি বন্দুকটিকে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণনা করে শ্রী সিংহ বলেন, এই বন্দুকটির ৭৫ শতাংশের বেশি ভারতে নির্মিত হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো সংস্থাকে ১০০টি কে-৯ বজ্র-টি বন্দুক সরবরাহের বরাত দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সংস্থাটি ৫১টি এ ধরনের বন্দুক সরবরাহ করেছে। অনুষ্ঠানে লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রী এ এম নায়েক এবং মন্ত্রকের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহ জিস্যাট-৩০-এর সফল উৎক্ষেপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের সর্বশেষ কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহ জিস্যাট-৩০ সম্প্রতি ফরাসি গায়ানার মহাকাশ বন্দর থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপিত হয়েছে। নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ফরাসি গায়ানার কৌরৌ উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে উৎক্ষেপণযান এরিয়ান-৫ ভিএ-২৫১ ভারতীয় সময় মাঝরাত ২.৩৫ মিনিটে ভারতের জিস্যাট-৩০ এবং ইউট্যালস্যাটের জন্য 'ইউট্যালস্যাট কানেক্ট' কৃত্রিম উপগ্রহ দুটিকে উৎক্ষেপিত করে।

উৎক্ষেপণের ৩৮ মিনিট ২৫ সেকেন্ড পর এরিয়ান-৫-এর উপরিভাগ থেকে উপবৃত্তীয় ভূসমালয় কক্ষপথে জিস্যাট-৩০ পৃথক হয়। ৩৩৫৭ কেজি ওজনের জিস্যাট-৩০ কক্ষপথে থাকা কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ইনস্যাট-৪এ-কে প্রতিস্থাপিত করবে।

ইসরোর চেয়ারম্যান ড. কে শিবন জানান, জিস্যাট-৩০ কেইউ ব্যান্ডের সাহায্যে ভারতের মূল ভূখণ্ড, দ্বীপপুঞ্জগুলিতে এবং সিব্যান্ড দিয়ে এশিয়ার পারস্য উপসাগরের বেশ কিছু দেশে ও অস্ট্রেলিয়ায় পরিষেবা প্রদান করবে। ডিটিএইচ টেলিভিশন সার্ভিস, ভিস্যাটের সঙ্গে যোগাযোগ, এটিএম, স্টক এক্সচেঞ্জ, টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম উপগ্রহ সহায়ক হবে। ডিজিটাল কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে খবর সংগ্রহ করা এবং ই-গর্ভন্যান্স অ্যাপ্লিকেশনের কাজেও এটি ব্যবহার করা যাবে।

কর্ণাটকের হাসানে ইসরোর মাস্টার কন্ট্রোল ফেসিলিটি জিস্যাট-৩০-এর নিয়ন্ত্রণ শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে এই কৃত্রিম উপগ্রহটির কোনো সমস্যা নেই বলে জানা গেছে। ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে ৩৬ হাজার কিলোমিটার ওপরে ভূসমালয় কক্ষে স্থাপনের পর এই কৃত্রিম উপগ্রহটিতে সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থার পাশাপাশি, তরঙ্গ প্রতিফলনের ব্যবস্থাও থাকবে।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা জেলার অমৃতি খণ্ড শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ সমিত মণ্ডলের পিতৃদেব ঘুরন মণ্ডল গত ৩ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া জেলার বৈদ্যপুর খণ্ড কার্যবাহ সোমেন মণ্ডলের বাবা গত ৩১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রী স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলার উত্তর দমদম নগরের শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ সুদীপ রায়ের পিতা প্রভাষ চন্দ্র রায় গত ১০ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্ত্রী ও ১ পুত্র রেখে গেছেন।

* * *

বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক তথা বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের জেলা সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী কমলা চট্টোপাধ্যায় গত ৬ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি দুই পুত্র, পুত্রবধূ, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

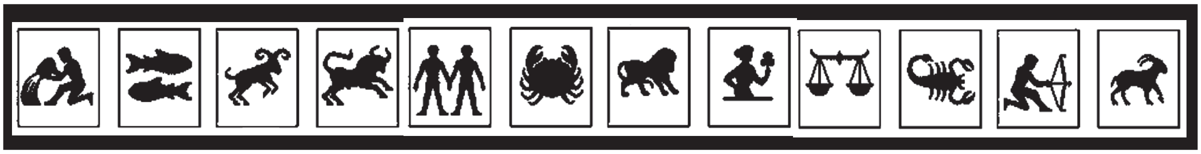

২৭ জানুয়ারি, (সোমবার) থেকে ২ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) ২০২০। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, বৃশ্চিকে মঙ্গল, ধনুতে বৃহস্পতি, কেতু, মকরে রবি, বুধ, শনি, কুম্ভে শুক্র। পুনরায় ১৩-০১-শুক্রবার, ভোর ৩টে ৬ মিনিটে বুধের কুম্ভে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কুম্ভে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র থেকে মেষে ভরণী নক্ষত্রে।

মেষ : স্বীয় প্রতিভার ব্যক্তিত্ব, বাক্‌মাধুর্যের সুষম প্রকাশে পরিবারের সমৃদ্ধির গতি বিস্তার। শত্রুক্ষয়, বন্ধুপ্রিয়, পুত্র লাভ। জ্ঞান, বিদ্যালাভে বর্ণময়জীবনে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। ট্রান্সপোর্ট, কৃষি যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায় নতুন উদ্যোগে সফলতা। জীবনসঙ্গীর কর্মসংস্থান ও সন্তানের উচ্চশিক্ষার প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ। শরীরের গোপন অঙ্গ ও চোখের চিকিৎসার প্রয়োজন।

বৃষ : গৃহের পরিবেশ, মাতার স্বাস্থ্য, জীবনসঙ্গীর হঠকারিতায় সুস্থিতি বিনষ্ট। কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা, দায়িত্ব সচেতনতা, নৈপুণ্যের ঘাটতি না থাকলেও কর্তৃপক্ষের ভূমিকা হতোদ্যমের কারণ। সংস্থার আর্থিক লেনদেনের দায়িত্ব কৌশলে এড়িয়ে চলুন। অবিবাহিতের নিজ পছন্দে বিবাহ যোগ। প্রেম সম্পর্কে পারস্পরিক ভুল- বোঝাবুঝির প্রভূত সম্ভাবনা। রক্তচাপের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত সমস্যার সম্ভাবনা।

মিথুন : সৃজনশীল কর্ম ও লোক সম্পর্কে শরীর, মন বুদ্ধি ব্যাপৃত থাকলেও রমণীর মায়াজালে তরঙ্গবেষ্টিত চিত্তভূমি। সন্তানের কর্মদক্ষতায় সম্ভ্রম ও সমৃদ্ধি। ভ্রাতা ভগ্নীর সঙ্গে পৈত্রিক সম্পত্তি বিষয়ক সফল আলোচনা। অগ্রজ ও চাকুরেদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। ভ্রমণ বাতিলে মনঃকষ্ট।

কর্কট : আর্থিক স্থিতি, মান-সম্মান। গৃহের পরিবেশ সুখকর নহে। ক্রীড়াবিদ, ব্যায়ামবিদ, শল্যচিকিৎসক, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, প্যাথলজিস্টদের কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি ও মান্যতা। সন্তানের প্রেমের স্মৃতি মন্থনে উৎসাহ-উদ্দীপনা। সপ্তাহের প্রান্তভাগে বিলাসদ্রব্য অশন-বসন ও ভ্রমণে সুখ ও আনন্দ।

সিংহ : বিরোধিতা ও শারীরিক কারণে অস্বস্তি-উদ্বেগ। কবি, লেখক, সাংবাদিক, সঞ্চালক, প্রকাশকের বুদ্ধি-চিন্তা ও কর্মের উৎকর্ষতায় সুনাম ও সৎকাজে নিযুক্তি। অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তা, বিশিষ্টজনের সান্নিধ্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সহায়তা ও সৌহার্দ্য। সরলতার পূর্ণ মূল্যায়নে যুবক বন্ধুর বিরোধিতা। জল পথে ভ্রমণ পরিহার করুন।

কন্যা : বিভিন্ন যোগাযোগ, পরিজন পরিবৃত হয়ে গীত, উৎসবে আনন্দ মুখর সময়। স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রাণশক্তির উজ্জ্বলতায় বিরোধিতা হ্রাস। জীবনসঙ্গীর রক্ষণশীল মনোভাবে সাংসারিক নেতিবাচক চিন্তার অবসান ও স্বস্তি। প্রবাস, ব্যবসায় উন্নতি, দাম্পত্য ক্ষেত্রে উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা।

তুলা : পারিবারিক দায়দায়িত্ব পালনে অপ্রত্যাশিত ব্যয়। আপনজনের সক্রিয়তায় লোকসন্তুষ্টি ও আনন্দময়তার প্রকাশ। পেশাদারীদের অধ্যাবসায় ও দক্ষতার মেলবন্ধনে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় হবে। বিদ্যার্থীদের কৌশলী ও আধুনিক মনস্কতা আশানুরূপ ফল লাভে অন্তরায়।

বৃশ্চিক : অস্বস্তিকর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তে অনুতাপ। জীবনসঙ্গীর নামে ব্যবসায় ইতিবাচক ফল, একাধিক উপার্জনের প্রশস্ত ক্ষেত্রে। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাবলীলতা ও বিজয়ীর সম্মান। গুরুজনের মূল্যবান পরামর্শে নতুন দিশার সন্ধান। অবৈধ প্রেম এড়িয়ে চলা শ্রেয়।

ধনু : মেধা, দৃঢ়তা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয়, নম্রতা ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতায় তীর্থদর্শন। স্বজন বাৎসল্যে সুকীর্তি, সন্তান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। ধনলক্ষ্মীর ধনবর্ষায় সময় অতিবাহিত হবে। নীতি ও আদর্শ কেন্দ্রিক আপোশহীন মানসিকতায় শ্রী ও সৌন্দর্য লাভ। মিত্র ও প্রতিবেশীর সাহায্যে দয়ার্দ্রহৃদয় ও উদারতার প্রকাশ। নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত, লিভারের পীড়া ও হজমের গণ্ডগোলের সম্ভাবনা।

মকর : কর্মে অতিরিক্ত দায়িত্ব ও আর্থিক সাফল্য। উচ্চাভিলাষীর ছল-চাতুরিতে অর্থদণ্ড ও সম্মানহানি। নিজ যোগ্যতানুযায়ী পছন্দমতো কর্মযোগ। আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা কঠিন। শরীরের মধ্যভাগে জন্য চিকিৎসককে দেখাতে হবে। পিতৃ, বিত্ত প্রাপ্তি, গুরুজনের পরামর্শ ও প্রতিবেশীর সহযোগিতা নব-নির্মাণে সহায়ক হবে।

কুম্ভ : অহেতুক দুর্ভাবনা ও অনিয়মে স্বাস্থ্যাবনতি। ঈর্ষাকাতর সহকর্মীর জটিল চক্রান্তের অবসানে কর্মে অগ্রগতি। রাজনৈতিক ঝামেলা আইন আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। নিকট বন্ধুর মন্দ ব্যবহারে ব্যথিত বোধ। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় বিলম্বিত সাফল্য। সপ্তাহের শেষভাগে ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণে শীতলতার সঞ্চার।

মীন : প্রেম, প্রীতি, স্নেহময়তা ও সৃজনশীলতায় সশক্ত মন। আর্থিক অপ্রতুলতা, মুখমণ্ডলের চোট-আঘাত, প্রতিবেশীর কুটচালে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দপতন। সন্তানের আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলবতী চেষ্টা, জীবনসঙ্গীর ভাগ্যোন্নতির সহায়ক। বিদ্যার্থীর অহংবোধে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—**শ্রী আচার্য্য**